গাজোল সরকারী প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষণ সংস্থা
সপ্তপর্ণী
২০১৮-২০১৯

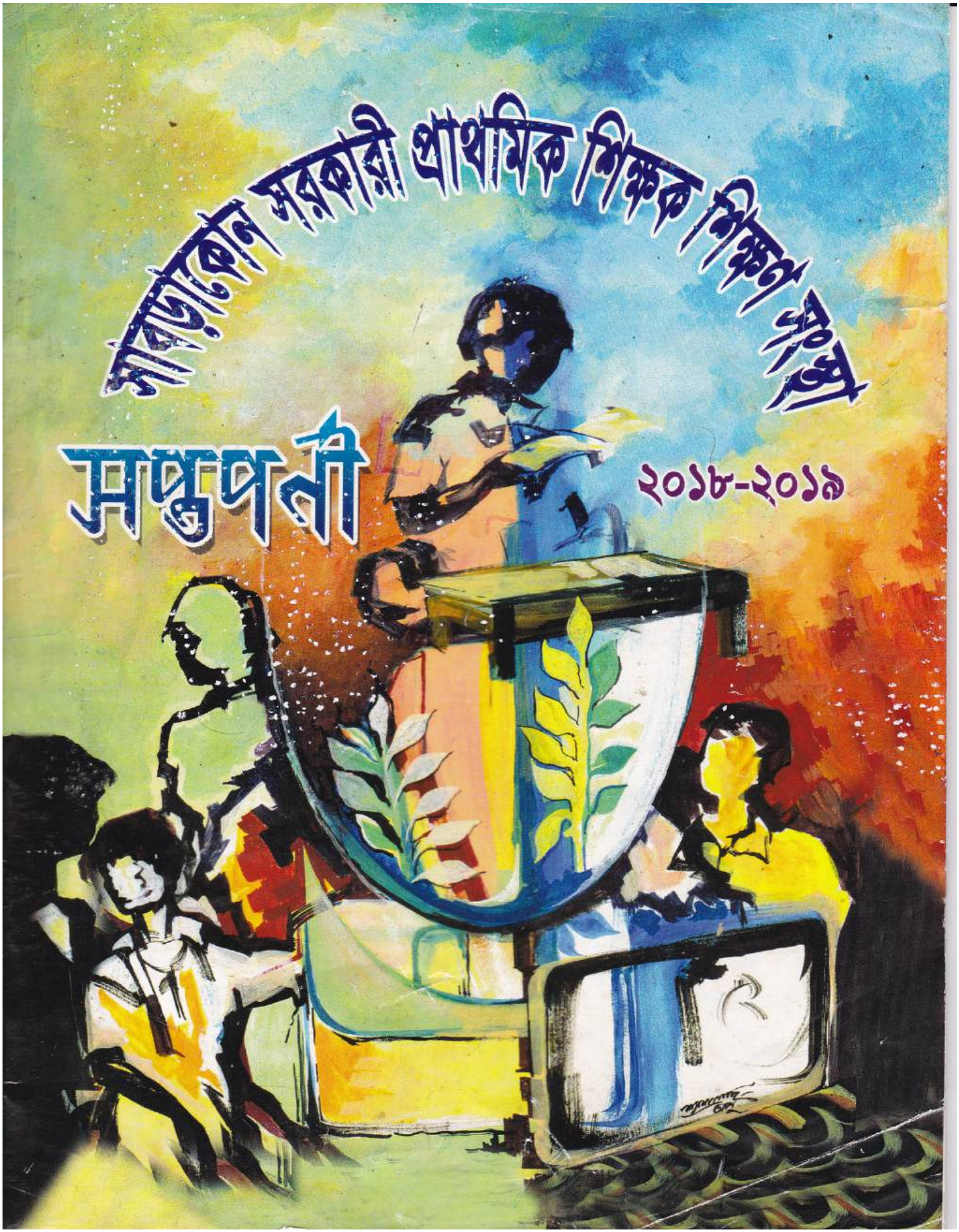

সাবড়াকোন সরকারী প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষণ সংস্থা

সাবড়াকোন :: বাঁকুড়া

২০১৮–২০১৯

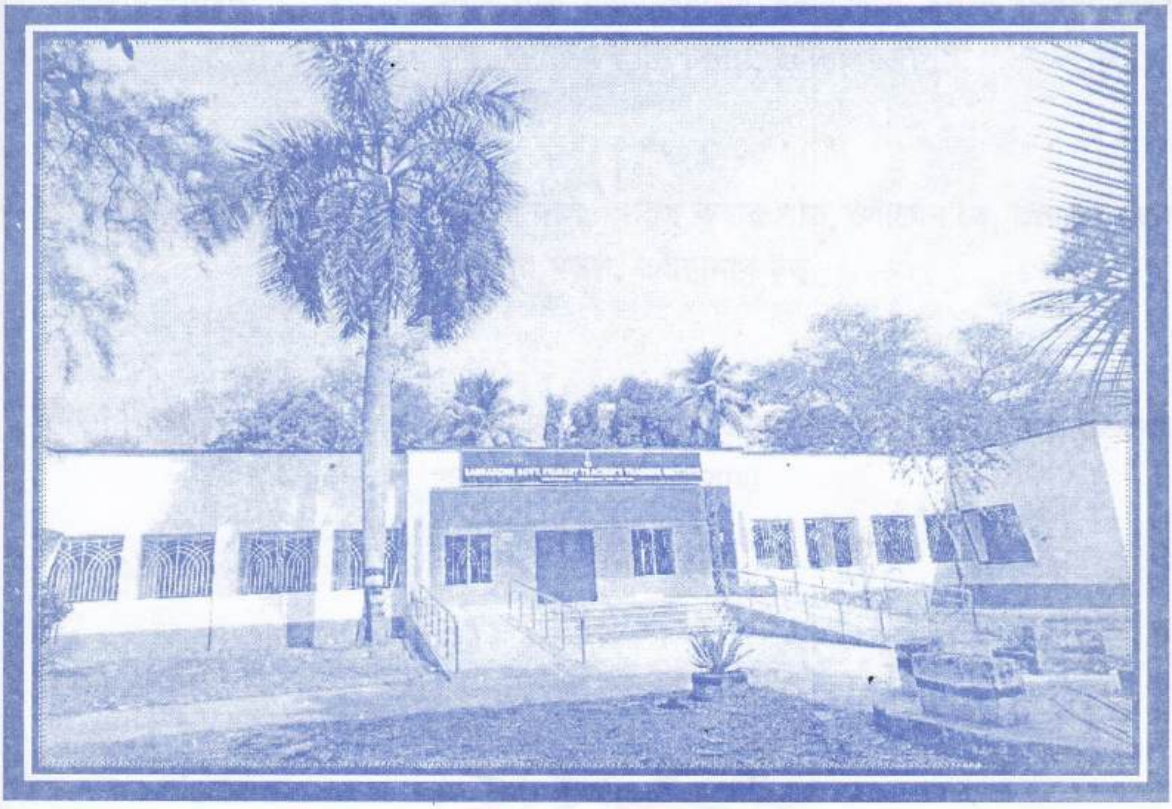

"গুরুর অন্তরের ছেলেমানুষটি যদি একেবারে শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায় তাহলে তিনি ছেলেদের ভার নেবার অযোগ্য হন। শুধু সামীপ্য নয়, উভয়ের মধ্যে প্রকৃতিগত সাযুজ্য ও সাদৃশ্য থাকা চাই, নইলে দেনা পাওনায় নাড়ীর যোগ থাকে না।"

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

–প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিভাগের পরিচিতি–

পত্রিকা বিভাগ ঃ

সভাপতি ঃ শ্রী মনোজ কুমার পান্ডে (ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ)
সম্পাদক ঃ শ্রী সুব্রত পাত্র (পত্রিকা বিভাগ)
সহ-সম্পাদক ঃ শ্রী রবীন কর্মকার

পত্রিকার সদস্য ঃ সুব্রত পাত্র, রবীন কর্মকার, বুবাই পাত্র, সুশান্ত দণ্ডপাট, জয়রাম কুন্ডু, ওয়াইস আলি মিদ্যা, অভিজিৎ বাসুলী

সাংস্কৃতিক বিভাগ ঃ রাজেশ দাস, অসীম কুমার পাত্র, সৌমেন দে, প্রিয়ব্রত মন্ডল, আসানুর মন্ডল, রবীন্দ্রনাথ টুডু

ক্রীড়া বিভাগ ঃ শুভম দত্ত, সুকান্ত টুডু, জনায়েদ মন্ডল, বাপ্পা মন্ডল, শুভ মন্ডল, পবন মন্ডল, সৌভিক সাহা

প্রতিষ্ঠানে যারা আছেন

শ্রী মনোজ কুমার পান্ডে	(ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ)
শ্রী শিবনারায়ণ সিংহ	(অধ্যাপক)
শ্রী শ্যামাপ্রসাদ সাঁতরা	(অধ্যাপক)
শ্রী পল্লব ঘোষ	(অধ্যাপক)
শ্রী সুব্রত পাল	(অতিথি অধ্যাপক)
শ্রী সুমন্ত দে	(অতিথি অধ্যাপক)
শ্রীমতী পিয়ালী দে	(অতিথি অধ্যাপক)
শ্রী রাজেন্দ্রপসাদ কর	(অতিথি অধ্যাপক)
শ্রী তারকনাথ আচার্য্য	(অতিথি অধ্যাপক)

রান্নাঘরের কর্মীবৃন্দ

শ্রী স্বপন কর
শ্রী রঘুনাথ দুলে
শ্রীতমী রমলা দুলে
শ্রীমতী সুমিত্রা দুলে

চলতি শিক্ষাবর্ষে সম্পাদিত বিশেষ কার্যাবলী

- স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন, প্রভাতফেরী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।
- নবকলেবরে পত্রিকা "সপ্তপর্ণী"র প্রকাশ।
- শিক্ষক দিবস উদ্‌যাপন।
- ব্রতচারী অভিপ্রদর্শণী।
- শিক্ষামূলক ভ্রমণ দক্ষিণ ভারত(কন্যাকুমারিকা, রামেশ্বরম, তিরুপতি, মাদুরাই)
- নেতাজীর জন্মজয়ন্তী পালন।
- প্রজাতন্ত্র দিবস উদ্‌যাপন।
- সরস্বতী পূজা।
- আন্তঃ ভবন ফুটবল প্রতিযোগিতা।
- আন্তঃ ভবন ক্রিকেট প্রতিযোগিতা।
- আন্তঃ ভবন ভলিবল প্রতিযোগিতা।
- বসন্ত উৎসব উদযাপন।
- রবীন্দ্রজয়ন্তী উদযাপন।
- গান্ধিজয়ন্তী উদ্‌যাপন।

ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের প্রতিবেদন

আপনসত্ত্বার বহিঃ প্রকাশই হলো জীবন সমাজের সহজাত ধর্ম। সৃষ্টির উষালগ্ন থেকেই মানুষ নিজের চিন্তনকে প্রকাশ করেছিল গুহাগাত্রে অঙ্কিত চিত্রে বা দুর্বোধ্য স্বরের ভঙ্গীমায়। সভ্যতার অগ্রগতির রথচক্র আজও ক্রমে এগিয়ে চলেছে উন্নতির শিখরে। সেই পথচলা আমাদেরও জীবনের অঙ্গ।

সুস্থ জীবনের লক্ষণ প্রকাশ পায় সাংস্কৃতিক মনন ও চিন্তনের মধ্যদিয়ে। সংস্কৃতির প্রকাশের অন্যতম মাধ্যম হল সৃষ্টিশীল মনের বৈশিষ্ট্যগুলির লিপিরূপ, আর এই প্রকাশেরই "সপ্তপর্ণী" আজ দৃশ্যমান। সাবড়াকোন সরকারী প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষণ সংস্থার বার্ষিক পত্রিকা। "সপ্তপর্ণী" এর পুনঃজন্ম হতে চলেছে। "সপ্তপর্ণী"কে বাঁচিয়ে রাখার জন্য যে পরিচর্যার প্রয়োজন শিক্ষক শিক্ষার্থীগণ তা দৃঢ়ভাবে পালন করতে যে বদ্ধপরিকর হবে প্রতিষ্ঠানের সকল শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মীবৃন্দের প্রেরণা ও আন্তরিক উৎসাহে এই আস্থা ও কামনা রইল।

ধন্যবাদান্তে–

মনোজকুমার পান্ডে

(ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ)

সাবড়াকোন সরকারী প্রাথমিক

শিক্ষক শিক্ষণ সংস্থা

সম্পাদকীয়

আমাদের পত্রিকা 'সপ্তপর্ণী'র পক্ষ থেকে সকল পাঠক-পাঠিকাদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। আপনাদের ভালোবাসাকে পাথেয় করে বেশ কিছুটা পথ আমরা একসাথে পেরিয়ে এলাম। এই পত্রিকার সম্পাদনার কাজ পেয়ে নিজেকে গর্বিত মনে হচ্ছে। 'সপ্তপর্ণী'র পুনঃজন্ম হতে চলেছে, তাই আমাদের লেখক, শিল্পী এবং সহযোগী বন্ধুদের অসংখ্য ধন্যবাদ।

আধুনিক বিজ্ঞান মানুষকে দিয়েছে বেগ কেড়ে নিয়েছে আবেগ। এই যন্ত্র সভ্যতায় মানুষ ভাবতে ভুলে যাচ্ছে। আজ সবার মুখে একই কথা 'হাতে যে একদম সময় নেই'। সাহিত্যচর্চা প্রায় অবহেলিত, বাংলা ভাষার পিঠ ঠেকে গেছে দেওয়ালে। তবুও কেউ কেউ তারই মাঝে মনের ভাব কলমের আঁচড়ে, অক্ষরের সুষম বিন্যাস সাদা কাগজের বুকে এঁকে যান। এভাবেই সৃষ্টি হয় কখনো কবিতা, কখনো গল্প বা আত্ম জীবনী, প্রবন্ধ, উপন্যাস ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গিকের জন্ম। শিল্পীর এই সৃজনশীল সৃষ্টিকে 'সপ্তপর্ণীর' মাধ্যমে বাঁচিয়ে রাখাই আমাদের প্রয়াস। 'সপ্তপর্ণীর' ছায়ায় যেন এই সৃষ্টি অবিরত থাকে পরবর্তী প্রজন্ম পর্যন্ত।

ধন্যবাদান্তে–

শ্রী সুব্রত পাত্র
পত্রিকা সম্পাদক
সাবড়াকোন সরকারী প্রাথমিক
শিক্ষক শিক্ষণ সংস্থা

–শিক্ষক দিবস উদ্‌যাপন–

–বিদ্যাদেবীর আরাধনায় আমরা–

–স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন–

–বসন্ত উৎসব উদ্‌যাপন–

–সূচীপত্র–

কবিতা

- কালজয়ী– শ্যামপ্রসাদ সাঁতরা
- হঠাৎ দেখা– অসীম কুমার পাত্র
- বাগ্‌দেবীর প্রতি– সৌমেন দে
- জীবন মানে– আজাহার আলি মন্ডল
- তুমি– অভিজিৎ বাসুলী
- পৃথিবী– সঞ্জীব ব্যানার্জী
- সারদা ভবন– জয়রাম কুন্ডু
- পরীক্ষার পড়া– শুভম দত্ত
- সুখের ঘর– সুশান্ত দণ্ডপাট
- সুমনবাবু– রাকেশ ঘোড়ুই
- I want to be everything for 'U'- Buddhadev De
- মা– দীপক ঘোষ
- এহো সান্তাড়– দুর্গাচরণ মান্ডি
- প্রশ্ন তোমার কাছে– শুভদ্বীপ কর
- নতুন আলো– শেখ সানিউল আলি
- সেকাল আর একাল– রামশংকর চক্রবর্তী
- হর– সুকান্ত টুডু
- আমি ভাবি– ওয়াইস আলি মিদ্যা
- বর্ষা– জয় দুলে
- শহীদ বীর জওয়ানদের প্রতি– কৃষ্ণপদ কর

প্রবন্ধ

- বিলুপ্ত প্রায় একটি গ্রাম্য উৎসব– মনোজ কুমার পান্ডে
- স্বাস্থ্যের সঞ্জীবনী সাইকেল– সুব্রত ভূঁই
- Education thoughts of Swami Vivekananda and Its implication in our educational system- Sumanta De

ছোটো গল্প

- জীবনের স্বাদ– সুব্রত পাত্র
- জাদুকর ও নিখোঁজ রহস্য– মনোজ ভট্টাচার্য্য
- অবিশ্বাস্য– রবীন কর্মকার
- দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ– বুবাই পাত্র

–কালজয়ী–

–শ্যামাপ্রসাদ সাঁতরা (সহকারী অধ্যাপক)

নীড় সন্ধানী পারাবত
প্রেম ভালোবাসা মাখে
কৃষ্ণ সাধানয় সতন্ত্র মানুষও
রাজা সেজে বিশ্বাস ভঙ্গ করে।
কলঙ্কিত আত্মজীবন ভীত সন্ত্রস্ত
সুশিক্ষা আত্মচেতনা কর্ম বুদ্ধিমত্তায়
বীর বিপ্লবী হৃদয়ে আনন্দে আপ্লুত সম্মানিত।
নিজেকে করেছো সমর্পিত জন্মভূমি ভারতে
দিনে রাতে কর্ম করে যাও মন প্রাণ ভরিয়ে
বিবেক মান রক্ষা করো আলো আঁধারে
রং তুলি আঁকে ছবি শিল্পীদের মননে
হিম পড়ে পালা করে শীত গানে
টুসু মা আপনজন পৌষ মাসে
সিরাজ হাকিম দীনমানে।
গাছে বসে ডাল কাটে ক্রিস
সাগরে পাড়ি দেয় নবীন নবিস।
যে মানুষের দান অন্য শরীরে জমা
অশিক্ষাতে পাই না জয় তর্কের গরিমা
গিরিরাজ জপ তপ করে কি পায় কি দায়
বিবেকের শীর তবু বলে চায় চায় শুধু চায়
কোটি কোটি জনগণ" আছে এই
মোহমহিমায়।
প্রলয়ঙ্কারী কালজয়ী কালী কালের
আলোকে
নব রবি প্রভাতের আকাশে মানুষেই শ্রেষ্ঠ
হলে বিশ্বলোক কর্মমুখর ভূ-মন্ডলের
করতলে।
যারা শুধু পড়ে পড়ে মার খায় কূটচালে
প্রাণে সুখ ঢেলে দাও এ বিশ্বের স্বস্থলে,
তুমি ছাড়া কিছু নাই কেহ নাই ওরে
মর্য্যাদাপূর্ণ আছ আহারে বিহারে।

)(

–হঠাৎ দেখা–

–অসীম কুমার পাত্র (২য় বর্ষ)

কবি তোর সাথে অনেকদিন পরে
দেখা হল এক পার্কে
তোকে দেখেই মনে পড়ে গেল
সকল পুরোনো স্মৃতি
এখন তুই বদলে গেছিস অনেক
চুলে পাক ধরেছে ঈষৎ
চোখের নীচে ফোলা
দামী সিগারেট ঠোটের কোনে।
কবি তুই পাল্টে গেছিস বড়
বুঝতে পারি না তোরমন
কাকে দিয়েছিস তোর মন ?
ঠিক করে বলতো একটুক্ষণ।
কবি তোর মনে পড়ে ?
পুরোনো আমাদের স্মৃতি
ঘাসের উপর পেপার পেতে
গল্প করে সময় কাটাতাম,
তুই চাইতিস তোরই সাথে
সর্বক্ষণ যেন ছায়ার মতো থাকি।
কিন্তু হ্যাঁ, আমি কথা রাখতে পারিনি
এখন আফসোস করি খুব।
দুজনের তিক্ত ঝগড়ার মধ্যেও
ছিল এক মিষ্টি ভালোবাসা
তুই বলতিস
তোর গায়ের পারফিউমের গন্ধ
আমাকে কাছে টেনে নেয় তোর
কত অবহেলার পরেও তুই
থাকতিস যে আমার প্রেমে বিভোর।
এখন কি সব ভুলে গেছিস তবে ?
কবি মৃদু হেসে ঘাড় নেড়ে উত্তর দেয়
কই কিছু মনে পড়ছে না তো।

)(

–বাগ্‌দেবীর প্রতি–

–সৌমেন দে (১ম বর্ষ)

মাগো তোমার পূজা আমি
প্রতিবছর করি,
শুভমতি দিও যেন
ভালোভাবে পড়ি।
আমায় তুমি বিদ্যা দিও
তোমায় দেব ফুল
পরীক্ষার খাতায় লিখতে গিয়ে
হয় না যেন ভুল।
একটু দেখে প্রশ্নগুলো
সহজ যেন হয়,
পেলে তোমার আশীর্বাদ
আর করি না ভয়।
শ্বেত হংস তোমায় দেব
বীনা দেব হাতে,
পরীক্ষার ওই কটা দিন
থেকো সাথে সাথে।
হলুদ গাঁদা দেবো তোমায়,
পলাশ দেবো লাল,
তোমার স্নেহ পাই যেন মা
আমি চিরকাল।

)(

–জীবন মানে–

–আজহার আলি মন্ডল (২য় বর্ষ)

জীবন মানেই পথ চলার শুরু
আর পথ চলা মানেই অজস্র বাধার সম্মুখীন হওয়া
আর ওই বাধা দেখে যেই তুমিযাবে থেমে
দেখবে তোমার জীবনে ঘোর অন্ধকার এসেছে নেমে।
আর ওই অন্ধকার সরাতেনা পারলে
কালের স্রোতে হারিয়ে যাবে তুমি।
মুছে যাবে পৃথিবী থেকে তোমার সব অস্তিত্ব
তাই বলি শত শত রক্তবিন্দুর বিনিময়ে
ধরে রাখো তোমার স্থায়িত্ব।
আর স্থায়িত্ব টিকিয়ে রাখতে হলে ভেঙ্গে ফেল সব বাধা
প্রতিটি পদক্ষেপে জাগিয়ে রাখো
তোমার নিজস্বতা।
শত শত রক্ত বিন্দু ক্ষয়ে যখন তোমার পথ চলার হবে শেষ
মনে হবে বাধা ভরা সেই দিনগুলিই ছিল ভালো সেই
দিনগুলিই ছিল বেশ।

)(

–তুমি–

–অভিজিৎ বাসুলী (২য় বর্ষ)

তুমি আমার আশার আলো
আঁধারের বাতি।
তুমি আমার নীলাকাশের
ছোটো একটি তারা।
তুমি আমার মনের
একমাত্র সাথী।
তুমি আমার পাতার মাঝে
রঙিন একটি ফুল।
তুমি আমার দুঃখের মাঝে
হারিয়ে যাওয়া সুখ।
তুমি আমার মনের আয়না
তোমায় ছাড়া আর কিছু চাই না।

–পৃথিবী–

–সঞ্জীব ব্যানার্জী (১ম বর্ষ)

হে পৃথ্বি, জগদ্ধাত্রী
তুমিই মোদের প্রাণ
তোমারে না ভূলিতে পারে
স্বয়ং ভগবান।
তোমার বুকের জন্ম নিয়ে
কত গর্ব তোমায় নিয়ে
তুমিই ভগবান।
হে পৃথ্বি, জগদ্ধাত্রী
তুমিই মোদের প্রাণ
জগতের মাতা তুমি
প্রাণকে আগলে রেখেছো তুমি
সে কী বুঝিছে তোমার সন্তান ?
জীবের সেরা করেছ যারে
মৃত্যুর মুখে ঠেলছে তোমারে
বুঝিতে কী পারছ তুমি ?

)(

ঃ সারদা ভবন ঃ

–জয়রাম কুন্ডু (১ম বর্ষ)

বামপাশেতে রান্নাঘর আর ডান পাশেতে সদন
তারই মাঝে রয়েছে আমার সুন্দর সারদা ভবন।
সেই ভবনের চারিদিকে গাছগাছালিভরা
তারা সদাই দিচ্ছে আমায় পাহারা।
পিছনেতে রয়েছে তার মস্ত এক বেল তরু
সামনেতে রয়েছে গোটা কয়েক দেবদারু।
ভবনটির সামনে আছে জবা নয়ন তারা
আছে এক জামগাছ বিরাট তার চেহারা।
আছে একটা পেয়ারা গাছ মিষ্টি তার ফল
একটি আছে পাতিলেবু রসেতে টলমল।
ভবনটি রয়েছে অতি সুন্দর প্রাচীর ঘেরা
মাঝে মাঝে বেরোয় চিতি আর চন্দ্রবড়া।
কাঁঠাল আছে শিরীষ্ টাছে আমার ভবনটায়,
তাই তো বলি অন্য কোনো শ্রেষ্ঠভবন নাই।
দাদাদের মুখে শুনেছিলাম এই ভবনের কথা
আনন্দ ও হাসির মাঝে আছে ক্ষনিকের ব্যথা।
সবার শেষে প্রণাম জানাই সারদা মায়ের পায়,
প্রণাম সেরে শেষ করি আমি বলার কিছু নাই।

)(

–পরীক্ষার পড়া–

–শুভম দত্ত (২য় বর্ষ)

পরীক্ষা সামনে এখন
পড়তে বসলে মনে হয়
ইতিহাসটি ভারি দুষ্ট
ইংরেজিটা নিয়ে বসলে
হে ভগবান! অঙ্ক যদি
তিন দশকে ত্রিশ পেলে
ভূগোলটাযে ভাবছি এখন
ম্যাপগুলো সব উল্টাপাল্টা
বিজ্ঞানে এই লাইনগুলো
বাংলাটাতো জলের মতো
ভালোই ভালোই Promotion টা
নতুন ক্লাসে পড়াবো আমি
মাথা ঘোরে বন্ বন্
পরীক্ষা দেব কেমন ?
সন তারিখের মেলা
শক্ত কথার জ্বালা।
তিনটি ভাগ হয়
নাইকো কোনো ভয়।
কেমন করে পড়ি
কী যে ছাই করি।
বুঝতে পারি সহজে
ঢুকিয়ে নিলাম মগজে
পেয়েই যদি যাই
ভালো করে তাই।

–সুখের ঘর–

–সুশান্ত দণ্ডপাট (২য় বর্ষ)

একটি শুয়োপোকা এসে
বসল আমার গোলাপগাছে।
গোলাপের ওই পাতা খেয়ে
বসে রইল ফুলের দিকে চেয়ে।
যখন সে হল প্রজাপতি
পেল সে এক নতুন সাথী।
তার সাথে গেল উড়ে
ওই দিগন্তেরও বেশি দূরে।
করল শপথ তারা দুজন
থাকবে সাথে জীবন মরণ।
হঠাৎ এক বিশাল ঝড়ে
আলাদা হল বহুদূরে।
তাদের কেউ আর নিলনা সাথে
দিশেহারা হয়ে রইল পথে।
আবার এল এক ঝড়
সেটাই পৌঁছে দিয়ে তাদের ঘর।
তারা গেল উড়ে ওই রঙিন ডানামেলে
মোর গোলাপ গাছের ফুলে।

–সুমনবাবু–

–রাকেশ ঘোড়ুই (১ম বর্ষ)

সুমনবাবু, সুমনবাবু
নয়তো মানুষটি চেহারায় খুব বড়ো কিংবা অতি ছোটো
সাধারণ চেহারা তাহার কিন্তু অল্প খাটো
ছিপছিপে গড়নের, আর সামান্য কালো,
ব্যাকরণে তাহার জ্ঞান খুবই ভালো।
সবাইকে করতেন তিনি অত্যন্ত স্নেহ,
তাই তো আমাদের কাছে তিনি শ্রেয়।
আমাদের সকলকে তিনি ভালোবাসতেন খুব,
সেইজন্য তার ক্লাসে আমরা থাকতাম নিশ্চুপ।
তিনি আমাদের মাঝে জাগিয়ে তুলতেন এগিয়ে যাবার শক্তি,
সারাজীবন করব মোরা সম্মান ও ভক্তি।

)(

I Want To Be Everything For 'U'

-*Buddhadev De* (2nd year)

I want to be 'Sun'
To give U some 'Fun'.
I want to be 'Rain'
To wash away all your 'Pain'.
I want to be 'Winner'
To fullfill your 'Desire'.
I want to be 'Spark'
To lighten the 'Dark'.
I want to be 'Best'
To give U some 'Rest'.
I want to say this to 'All'
Who Love me as a 'Pal'.

–মা–

–দীপক ঘোষ (১ম বর্ষ)

মা মা মা, ওগো আমার মা
তোমায় ছাড়া এক মূর্হর্ত
থাকতে পারি না।
তুমিই প্রথম দেখিয়েছিলে
এই পৃথিবীর আলো,
সেদিন আমি ছিলাম মাগো
তোমার কোলে ভালো।
তুমি আমায় শিখিয়েছিলে
হাতে কলম ধরতে,
তুমি আমায় শিখিয়েছিলে
প্রথম কথা বলতে।
তুমি আমার জন্মদাত্রী তুমি আমার মা,
তোমায় ছাড়া এক মূহূর্ত
থাকতে পারিনা।
এই জীবনে চলার পথে
যদি মা করি ভুল
চড়থাপ্পড় মেরো আমায়,
ধরো মাথার চুল।
তুমি যদি ডাকো মা
খোকা খোকা বলে,
যেখানেই আমি থাকি মাগে
আসব তোমার কোলে।
তুমি আমার চোখের মনি, তুমি আমার মা
তোমায় ছাড়া এক মূহূর্ত
থাকেতে পারি না।

)(

ঃ এহো সান্তাড় ঃ

–দুর্গাচরণ মান্ডি (২য় বর্ষ)

বডেঃ কান সাঁওতা ঔরি
বহে লঃ কান দিশম ঔরি
চেদাঃ বাম ঔয়কীও এদ্ খেরওয়াল ঔনীড়ি॥
বীর বানটা ফুরগীল কাতে ক চালাও আকান্
এনতে রেহ চেদাঃ খেরওয়াল বাবন এভেন নঃ কান্ ॥
মেনাঃ তারন আয়ো আড়াং
এন তে রেঁহ বাম চেৎ এদা মাড়াং
চেৎ এদামএটাঃ আড়াং॥
মেনাঃ তাবন জানাম হাসা
এনতে রেঁহ চেদাঃ বাবন চাষা
আকরিঞ এঞাদাবন ঝত হাসা॥
মেনাঃ তাবন ধরম
মেনাঃ তাবন শরম
এনতে রেঁহ চেদাঃ বাবন যুমিদঃ আব লল বহঃ॥
এভেনঃ মে খেরওয়াল
এভেনঃ মে সান্তাড়
বাগিয়াম কান্ এটাঃ লাকচার॥
এভেনঃ মে খেরওয়াল
এভেনঃ মে আদিম সান্তাড়
জিয়ীড় দহয় মে আমাঃ লাকচার॥

)(

ঃ প্রশ্ন তোমার কাছে ঃ

–শুভদ্বীপ কর (২য় বর্ষ)

ভালোবাসাতে কষ্ট কেনো এতো
কষ্ট গেলে ভালো থাকবো হয়তো
তোমার উপর শুধু ছিল আমার অধিকার
তবে আমায় আজকে কেন করলে ছারখার
কষ্ট করে যখন বেসেছিলাম ভালো
তবে তুমি একলা করে চলে গেলে কেনো
বলে ছিলে তুমি শুধু আমার–
সারা জীবন বাসবে শুধু ভালো
যদি ছেড়েই দেবে–
তাহলে আমার জীবন সাথি হয়ে এসেছিলে কেন ?
নাকি আমায় শুধু কষ্ট দেওয়ার জন্য
যদি একষ্টের বোঝা আমি বইতে না পারি
চলে যাবো অনেক দূরে
এই পৃথিবী ছাড়ি
ভালোবাসার কষ্টের নেই কী কোনো শেষ
তবে আমি আমার এ জীবন করবো নিঃশেষ।

–নতুন আলো–

–সেখ সানিউল আলি (১ম বর্ষ)

শুনবো না আর শুনবো না ভাই
কোনো কথা শুনবো না
টিপছাপে যে হাজার বলাই
সে বীজ আর আর বুনবো না।
নীল আকাশে ঘন ধোঁয়ায়
ঢাকা ছিলাম কতকাল
সাক্ষরতার আলোর ছোঁয়ায়
ধরে ফেলেছি বাবুর চাল।
আমরা এখন নতুন সকাল
বুড়ো হলেও নবীন কাঁচা
কুমির ডাকতে কাটব না খাল
সাইন করে থাকব সাচা।

)(

সেকাল আর একাল

–রামশংকর চক্রবর্ত্তী (২য় বর্ষ)

আর্যযুগের কথা আমি বলছি এখন আজ
মানুষগড়ার কাজই ছিল আর্যদের কাজ।
অপলা, ঘোষা, বিশ্ববারা, লোপামুদ্রা, গার্গী
নারী হয়েও পুরুষদের সঙ্গে করত তর্কাতর্কি।
অদম্য শ্রদ্ধা ভক্তি ছিল পিতামাতার প্রতি
মানুষের মতো মানুষ গড়তে তারাই ছিলেন ব্রতী।
ঘোর কলিতে ভক্তি নাই দেব-দ্বিজে
মোবাইলের কবলে পড়ে মরছে নিজে নিজে।
সোশাল সাইটে মত্ত সবাই টুইট করার ধুম
সারারাত্রি জেগে জেগে দিনে দিচ্ছে ঘুম।
মানবগড়া তখন ছিল এ?খন দানবগড়ার দীক্ষা।
অর্থের বিনিময়ে আজ বিক্রি হচ্ছে শিক্ষা।
আসল শিক্ষা মার খাচ্ছে অভাবের তাড়নায়
লক্ষ্য লক্ষ্য বেকারত্ব ভরছে সমাজটায়।

–ঃ হর ঃ–

–সুকান্ত টুডু (২য় বর্ষ)

ধারতিরে আবোগে আদিম গড়
অনাতে আবোদ সান্তাড় তেবন বড়
আরবন পাজা জং কান আপান আপিন হর,
অলঃ পাড়াহাঃ তেম সেড়াঃ কান
ছাতিক লেকাম সাজাঃ কান
বয়হা, জানাম আড়াং এম বাগিয়াঃ কান।
এহো বয়হা হানে কয়গ্ পেসে সাঙ্গিঞ
পাঁসি আবো লাগিৎ মেনায় মাসে তাঙ্গি
আমতে ঞেলঃ লাগিৎ আগুয়মে আরসি
জাতি ধরম তেগোঁয় লাগিৎ সাব মেসে পাঁরসি।
পাঁরাসি গেতাবন আবোয়াঃ তাড়াম সিড়ি
তিসহঁ বাবন সাবা তিরে ধিরি,
আবো তেঁগো কেটেজ লাগিৎ মেনাঃ তাবন ভাষা
জিওয়ী বাঞ্ছাও লাগিৎ মেনাঃ তাবন হাসা
এহো বয়হা চেদাঃ হানতে নাতেবন ঞির
অলচিকিতে দেসে আবো হবন ইর ॥

)(

–ঃ আমি ভাবি ঃ–

–ওয়াইস আলি মিদ্যা

যতই করি আমার আমার
কিছুই আমার নয়;
খেলনা নিয়ে খেলছি খেলা
রয়েছে ভাঙার ভয়।
মায়ার জালে জড়িয়ে আছি
চায়না বের হতে,
ডাক আসলেই যেতে হবে
কেউ কি যাবে সাথে ?
যা কিছু আকড়ে নিয়ে
নিজের বলে ভাবি,
রইবে পড়ে যে যার মতো
ছাড়তে হবে সবই।

যত্নেগড়া শরীর
মাটিতে মিশে যায়,
দুদিন বাদেই ভুলবে সবাই
তখন কোথায় ঠাঁই ?
কর্ম দিয়ে বেঁচে আছে
জগৎ মাঝে মান,
মরে গিয়ে যারা অমর
তাদের জানাই প্রণাম।

)(

)()()(বর্ষা)()()(

–জয় দুলে

তুই খুব জেদী,
তাই এক-নাগারেই ঝরে যাস!
বুঝতে পারি সবার ব্যাথায়,
তুই বেশি কষ্ট পাস!
ফিরতে পারিস না আর ঘরে,
তুই তো যাযাবর ॥
বল দেখি তোকে ছাড়া,
আকাশ বাঁধবে কেমন করে ঘর ॥
বাতাস তোর খুব প্রিয়
ওর সাথে তুই ঘুরিস,
কোথায় তুই লুকিয়ে থাকিস ?
তোর ঠিকানাটা প্লিজ আমাকে বলিস ॥
কষ্টগুলো বুঝতে পেরে,
নরম গাল বেয়ে ঝরে যাস ॥
আকাশের বুকে 'বৃষ্টি' আর এই বুকে 'জল'
হয়ে সারাজীবন পাশে থেকে যাস।

)(

)) শহীদ বীর জওয়ানদের প্রতি ((

–কৃষ্ণপদ কর

দিনটা হল–
২০১৯ এর ১৪ই ফেব্রুয়ারী,
ঘটল যা ঘটনা,
কাশ্মীরের পুলওয়ামার কাছে,
হল এক ভয়াবহ জঙ্গিহানা।
কাঁপল গোটা ভূস্বর্গ, জঙ্গিরা
চালাল গুলি গোলা,
ভারতীয় জওয়ানদের উপর,
তারা করল যে হামলা।
এই হামলায় আহত কিছু প্রাণ,
কিন্তু, হয়েছে শহীদ বহু জওয়ান।
বীর শহীদ জওয়ানদের প্রতি,
আমার রইলো গভীর শ্রদ্ধা.....
জ্বালিয়ে সবাই মোমবাতি,
করি তাদের আত্মার শান্তি কামনা।

)(

বিলুপ্তপ্রায় একটি গ্রাম্য উৎসব

-মনোজ কুমার পান্ডে (ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ)
(সাবড়াকোন সরকারী প্রাথমিক শিক্ষকশিক্ষণ সংস্থা)

সেদিন 'দেশ' পত্রিকার একটি সাম্প্রতিক সংখ্যায় প্রকাশিত কবিতাগুলি পড়ছিলাম। এমনিতে আধুনিক কবিতা আমার খুব একটা ভাল লাগে না– কারণ হয়ত বুঝতে না পারা। তবুও উল্টেচ্ছিলাম পাতাগুলো– একটা কবিতা পড়লাম তার অর্থ ঠিকমতো বোধগম্য হল না– কিন্তু কবির নামটা অদ্ভুত ঠেকল– "পৌষালী"– তাঁর জন্ম হয়ত পৌষমাসে। এরকমই বেশ সুন্দর সুন্দর নাম হয়– বৈশাখী, শ্রাবণী কিংবা ফাল্গুনী। আচ্ছা কোন মেয়ের যদি ভাদ্র মাসে জন্ম হয়– কী নাম দেবেন বলুনতো– ভাদ্রী, ভদ্রাণী, সুভদ্রা.....?

আচ্ছা "ভাদু" নামটা কেমন লাগে– একটু কী অপরিচিত ? কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটা অঞ্চলে নামটা বহুল প্রচলিতা বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম বর্ধমান, দক্ষিণ বীরভূম কিংবা মেদিনীপুরের কিছু অংশে এই নামটা রীতিমতো পরিচিতা বহুকাল ধরে এই অঞ্চলের কুমারী মেয়েরা সারা ভাদ্রমাস জুড়ে 'ভাদু' উৎসব পালন করে।

আমার দেখা ভাদু উৎসব

আমার জীবনের অনেকটা অংশ কেটেছে বাঁকুড়ার একটি প্রত্যন্ত গ্রামে। ছোটবেলায় দেখতাম শ্রাবণ মাসের সংক্রান্তির পরেরদিন, গ্রামের মেয়েরা মাথায় করে প্রতিমা নিয়ে যেত। একটি সুন্দরী মেয়ে বসে, এক হাতে ফুল, অন্য হাতে বরাভয় মুদ্রা– এ হল প্রতিমার বিষয়-বস্তু। খুব আনন্দের সঙ্গে প্রতিমাগুলি নিয়ে যেত,– মা জিজ্ঞাসা করলে বলত পাশের গ্রামের কুমোরের কাছ থেকে কিনেছে। –সারা বছর ধরে এই পুজোর জন্য পয়সা জমা রেখে দেয়। আমাদের Quarter গ্রাম থেকে একটু দূরে ছিল। সুতরাং গ্রামের খুঁটিনাটি ঘটনা আমাদের চোখে পড়ত না। ভাদ্র মাসের সংক্রান্তির দিন চারিদিকে মাইক বাজত, গ্রামের মেয়েরা মাইকে ভাদুর নামে সুর করে গান গাইত– সেই গানের ভাষা, তাদের নিজের মতো, আর বিষয়বস্তু তাদের দৈনন্দিন জীবনের ঘটনাকেন্দ্রিক। ঐ সময়ে আমাদের গ্রামে (ঐ গ্রামে আমার জীবনের ২৫টা বছর কেটেছে– যার ফলে মনে হয় যেন আমারই গ্রাম– আমার মাতৃভূমি) আর একটি বড়ো উৎসব হয়, "মনসাপূজা"– এটা গ্রামের সবচেয়ে বড় উৎসব, খুব ধুমধাম করে গ্রামের মানুষ এই উৎসব পালন করে। ঐ "মনসা পূজার" আড়ম্বরের মধ্যেও "ভাদু" উৎসব আলাদা স্থান করে নিত– চারিদিকে মাইক বাজত, গ্রামের অনূঢ়া মেয়েদের কলকাকলিতে মুখরিত হয়ে উঠত। ১লা আশ্বিন ভাদুর ভাসান হত, গ্রামের মেয়েরা বিরস বদনে, তাদের আদরের ভাদুকে পুকুরের জলে ডুবিয়ে দিত। এইভাবেই শেষ করত "ভাদু উৎসব"– আবার একবছরের জন্য প্রতীক্ষা।

ভাদুর পরিচিতি

"ভাদু" আমাদের তেত্রিশ কোটি দেবদেবীর মধ্যে পড়েন না, আবার গ্রাম রক্ষাকারী যে সমস্ত লৌকিক দেবদেবী আছেন "ভাদুকে" তার মধ্যেও ফেলা যায় না। প্রচলিত পূজার ধ্যান

ধারণার সঙ্গে ভাদুপূজার কোন মিল নেই কোথাও। ধূপ নেই, চন্দন নেই, পুষ্পাঞ্জলি নেই, অর্ঘ্য নেই, মন্ত্র,নেই, পুরোহিত নেই,আছে শুধু সংগীত আর সংগীত। এই গানগুলোর মধ্যে কোথাও ভাদুকে দেবী বর্ণনা করা হয়নি– বর্ণনা করা তাদেরই আদরের মেয়ে হিসেবে, সঙ্গী হিসেবে।

ভাদু সম্পর্কে একটা কিংবদন্তী প্রচলিত আছে, সেটা হল পুরুলিয়া জেলা (মানভূম) অন্তর্গত কাশীপুরের মহারাজা শ্রী নীলমণি সিং দেও এর একটি পরমাসুন্দরী কন্যা ছিলেন। তাঁর নাম ভদ্রেশ্বরী। কন্যাটি দেব দ্বীজে বিশেষ অনুরক্তা ছিলেন। কেউ বলেন অবিবাহিতা অবস্থায় তাঁর মৃত্যু ঘটে, কেউ বলেন অবিবাহিতা ছিলেন তিনি।

ভাদু গানের বিষয়বস্তু

ভাদু উৎসব গ্রামের কুমারী মেয়েদের উৎসব। ভাদু তাদের কাছে আদর্শ, আবার তাদেরই মতো একজন এবং সে কারণে ভাদু গানের মধ্য দিয়ে ফুটে ওঠে রাঢ় বাংলার কুমারী মেয়েদের আশা আকাঙ্খার প্রতিচ্ছবি, এর মধ্যে ফুটে ওঠে কন্যার প্রতি পিতার স্নেহ। ভাদু যেন আরো পাঁচটি মেয়ের মতো ঘরেরই একটি মেয়ে।

আষাঢ় মাসে চাষ কৈরিছি
আনব ভাদু ভাদরে।
দামুদরে বান ডেকেছে
খেয়া লাউ নাই চলে।
হেই দামদুর পায়ে পড়ি
টুকচা তুমি বান কামাও
বছর পরে ভাদু আসবেক
লাউ বুকে ভাসতে দাও।

একবছর পরে ভাদু ঘরে এল। এখানে ভাদু স্নেহের কন্যা। একবছর পরে ঘরে আসার জন্য অভিমানী মাতৃ হৃদয়ের অভিযোগ ঃ–

ভাদু বল মোরে
ভুলেছিলে এতদিন কেমন করে
আসা পথে থাকতাম বেয়ে গো
চাঁদ মুখ দেখিবার তরে।

এছাড়াও গ্রামের মানুষের দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন সমস্যা– যেমন কুমারী মেয়ের বিয়ের সমস্যা, মেয়ের বিয়ের চিন্তায় বাবা মায়ের মর্ম যন্ত্রনা বর কেমন হবে তাও ভাদুর গানে পাওয়া যায়– মেয়ের একদিন বিয়ে হয়– মেয়ে শ্বশুর বাড়ি যায়– পিতালয় ছেড়ে শ্বশুর বাড়ি যাবার সময় মেয়েরা প্রাণ ডুকরে কেঁদে ওঠে,

কাঁদছ কেন সাধের ভাদু
বারবির ডাল ধৈর্য্যে।
পিতা না হয় দান কৈর্য্যেছে
শ্বশুর ঘর যাবার তরে।

এরকম দৈনন্দিন কত শত দুঃখ, কষ্ট, আশা আকাঙ্খা, স্বপ্ন, কল্পনাকে ঘিরে গান রচনা করা হয় এবং ভাদুকে উদ্দেশ্য করে গাওয়া হয়। এইভাবে ভাদু গান হয়ে ওঠে সাধারণ মানুষের জীবনের প্রতিচ্ছবি।

কয়েকদিন আগে আমাদের প্রতিষ্ঠানের এক ছাত্রের সঙ্গে এখানকার একটি Library যাচ্ছিলাম, উদ্দেশ্য ছিল "লোক সাহিত্যের" উপর কিছু বইয়ের খোঁজ করতে। ছেলেটির বাড়ি পুরুলিয়া জেলার কোন একটা গ্রামে। জিজ্ঞেস করলাম তোমাদের গাঁয়ে "ভাদু উৎসব" হয় ? উত্তর দিল, হ্যাঁ স্যার! এর পরের প্রশ্ন ছিল ভাদু উৎসব সম্বন্ধে কিছু জান কি না, কি বলল জানেন "ভাদু সম্পর্কে কিছুই জানিনা" অদ্ভুত লাগল, এ কথা শুনে,– যে উৎসবের জন্য পুরুলিয়া বিখ্যাত, যে উৎসবের নায়িকার সৃষ্টি পুরুলিয়াতে, সেখানকারই গ্রামের ছেলে বলে কিনা, সে এ সম্বন্ধে কিছুই জানে না! আসলে দোষটা কিন্তু পুরুলিয়ার কিংবা আমাদের দেশের বর্তমান প্রজন্মের নয়– দোষটা বর্তমান কিন্তুর স্বামীর সঙ্গে ঘর করতেন না। তাঁর মৃত্যুর পর রাজা দারুণ মানসিক আঘাত পান এবং কন্যার স্মৃতিরক্ষার্থে ভাদ্রমাসে ভাদু উৎসব রাজ্য মধ্যে প্রচলন করেন।

এই কিংবদন্তী নিয়ে বিতর্ক আছে– এই কিংবদন্তীকে সমর্থন করে কোন গান অতীতে রচিত বা গীত হয়নি। ভাদু গানগুলি যেখানে বিশেষ বিশেষ ঘটনা অবলম্বনে রচিত এবং গীত হয় সেখানে এতবড় একটা ঘটনা গীত রচনাকারীদের নজর এড়িয়ে গেল কি করে। হয়তো এরকম কোনও ঘটনাই ঘটেনি। বিশেষজ্ঞদের অভিমত রাজা নীলমণি সিংদেও এর ভদ্রেশ্বরী বলে কন্যাই ছিল না। তবে এটা ঠিক কাশীপুরের রাজ বাড়িতে ভাদু উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই নিয়ে গানও আছে। নীচের গানটি বহুল প্রচলিত ঃ–

কাশীপুরের মহারাজা
সে করে ভাদু পূজা
হাতেতে মা জিলিপি খাজা
পায়েতে ফুল বাতাসা।

আর একটি গানের সন্ধান পাওয়া যায় যেখানে ভাদুকে রাজকুমারী বিশেষনে চিহ্নিত করা হয়েছে।

বেড়ো যাব পদ্ম আনব
তার বেনাব সিংহাসন
তার ভিতরে খেলা করে
রাজকুমারী ভাদু ধন।
রাজকুমারী ভাদু আমার
দুঃখের মর্ম জানে না।
শুকালে দুধেরই গলা,
হায় মরি কাঁদে সনা।

এখানে "রাজকুমারী" শব্দটি গৌরবার্থে ব্যবহৃত হয়েছে– রাজার মেয়ে হিসেবে নয়।

কেউ কেউ ভাদু উৎসবকে ছোটনাগপুরের "কূর্মী ক্ষতিয়" সম্প্রদায়ের "করম" উৎসবের হিন্দু সংস্করণ বলে মনে করেন। করম উৎসব শুরু হয় ভাদ্রমাসের শুক্লপক্ষের একাদশীর দিন

থেকে। এই একাদশীকে "করম একাদশী বলে– উৎসব শেষ হয় পূর্ণিমার দিন। একটি ঝুড়িতে পঞ্চশস্য আর বালি রেখে কিছু লৌকিক আচার ও সংগীত সহযোগে উৎসব পালন করা হয়। এই গানগুলিকে "জাউয়া" গান বলে। যদি ভালোভাবে লক্ষ্য করা হয় তবে দেখা যাবে, ভাদু উৎসবের সঙ্গে এর মিল খুবই নগন্য। সুতরাং এই ধারণাও ভ্রান্ত।

কিছু কিছু বিশেষজ্ঞ মনে করেন ভাদু উৎসব ফসল ফলানোর উৎসব। ফসলের সঙ্গে এই উৎসবের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। পরিস্থিতির, পরিবেশের যুগের। আমরা বাস করেছি বিশ্বায়নের যুগে– যেখানে সমগ্র বিশ্বকে এক ছাতার তলাতে আনার চেষ্টা হচ্ছে। 'বিশ্বায়ণ' নামক এক অতিকায় দানব যেন সবকিছুকে গিলে ফেলতে চাইছে–সে অর্থনীতি হোক, সমাজনীতিই হোক কিংবা শিল্পনীতি অথবা সাহিত্য, সংস্কৃতি.....। আমরা যেন হারিয়ে ফেলছি আমাদের নিজস্ব সত্বা, নিজস্বতাবোধ, নিজের পরিচয়।

বৈদ্যুতিন্ গণমাধ্যমগুলি যেন এই দানবের দোসর হয়ে এসেছে– হরেক রকম উপগ্রহ চ্যানেলের মাধ্যমে ২৪ ঘন্টা ধরে জোর করে গেলানো হচ্ছে সেই মন্ত্র যার দ্বারা আমরা ভুলে যাব আমাদের নিজের সংস্কৃতি, নিজের পরিচয়। সাম্যবাদীরা অবশ্য এব্যাপারে খুশি হতে পারেন, শুধু খুশি নয় খুব খুশি– তারা দেশে দেশে বহুদিন লড়াই করে যে সাম্যাবস্থা আনতে পারেনি, আজকের বিশ্বায়ন খুব দ্রুত যেন সেই সাম্যবস্থা নিয়ে আসছে– যে অবস্থায় আমরা ভুলে যাব আমরা কোনো দেশের, কোনো দেশের মানুষ কি আমার পরিচয়।

)(

"পরার্থে এতটুকু কাজ করলে ভেতরের শক্তি জেগে ওঠে। পরের জন্য এতটুকু ভাবলে ক্রমে হৃদয়ে সিংহশক্তি সঞ্চার হয়।"

–স্বামী বিবেকানন্দ

স্বাস্থ্যের সঞ্জীবনী– সাইকেল

–সুব্রত ভূঁই (১ম বর্ষ)

'সাইকেল' শব্দটি আমার মনে হয় প্রায় সমস্ত ছেলেমেয়ের ছোটবেলা মনে করিয়ে দেয়। প্রথমে হাফ প্যাডেল দিয়ে শুরু, তারপর একদিন সিটে বসে সাইকেল চালানো মধ্যে যে আনন্দ তা আজও মনে পড়লে মনটা আনন্দে ভরে যায়। বর্তমানে অবশ্য ছেলেমেয়েরা স্কুলের গন্ডি পেরোনোর সঙ্গে সঙ্গে বাহন হিসাবে সাইকেলের পরিবর্তে মোটর সাইকেলের ওপর ঝুঁকে পড়ছে। ফলে এই বাহনটির ব্যবহার সমাজে ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে। এখন সাইকেল হল গরিবের বাহন। এখনও গ্রামাঞ্চল ও ছোটো ছোটো শহরে সাইকেল-এর দেখা মিললেও বড় বড় শহরে এর উপস্থিতি খুবই কম। অর্থাৎ বলা যায় সাইকেলের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ অন্ধকারের দিকে।

শিশু প্রথম মায়ের কোলে পৃথিবীর মুখ দেখে। তারপর আস্তে আস্তে হামাগুড়ি, দু-পায়ে সোজা হয়ে দাঁড়ানো, তারপর সোজা হয়ে হাঁটা। বেশ, এরপরেই সমাজের সঙ্গে তালমেলানোর জন্য শুরু হয় তার ছোটা। ক্রমে সময় ও কাজের পরিবর্তনের জন্য সে আবিষ্কার করে ফেলে চাকার। চাকার আবিষ্কারের ফলে হয় সাইকেলের উদ্ভব।

হাজার হাজার বছর আগে মিশরীয়রা প্রথম সাইকেল এর সূচনা করেন। এরপর 1817-18 খ্রিঃ Baron Von Dvais (জার্মানি) প্রথম দুই চাকার সাইকেলের আবিস্কার করেন। অবশ্য দুটি চাকার মধ্যে সামনের চাকাটি ছিল অপেক্ষাকৃত বড় এবং সাইকেল এর প্যাডেল ছিল না। এরপর Pierre Lallement (ফ্রান্স) সাইকেল এর সামনের বড় চাকাতে প্যাডেল যুক্ত করে সাইকেলকে এক নতুন রূপ দিলেন। এরপর ইংল্যান্ডের ডিজাইন করে আমাদের সামনে তুলে ধরলেন।

বর্তমানে এক রিসার্চ অনুসারে সবচেয়ে বেশি সাইকেল ব্যবহার হয় ডেনমার্কের রাজধানী কোপেন হেগেন-এ দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে আমস্টারডাম। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হলো সাইকেল ব্যবহারে প্রথম কুড়ির মধ্যে এশিয়ার কোনও দেশই নেই। অথচ সাইকেলই একমাত্র বাহন যেকোন খরচ না করিয়ে, কোনওরকম দূষণ না ছড়িয়ে আমাদের একস্থান থেকে অন্যস্থানে নিয়ে যেতে পারে।

WHO-এর মতে, ১৮–৬৪ বছর বয়সের সমস্ত ব্যক্তির দৈনিক ২০মিনিট সাইক্লিং করা উচিত। যা করলে সাইকেল শুধু বাহন নয়, আমাদের স্বাস্থ্যের সঞ্জীবনী হয়ে উঠবে। আসলে মানুষের আর্থিক স্থিতি যখনই বাড়তে থাকে তখনই মানুষ মোটর কার এর উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। কিন্তু একটু ভাবলেই বুঝতে পারবো সাইকেল আমাদের স্বাস্থ্য ও পরিবেশের বন্ধু। কোনও ব্যক্তি যদি নিয়মিত সাইক্লিং এর অভ্যাস রাখে তাহলে–

ঃঃ তাঁর ওজন কমবে।

ঃঃ অবশ্যই Energy বাড়বে। তাছাড়া Calarie Loss হবেই।

ঃঃ সবচেয়ে বড় কথা আমাদের আর্থিক লাভ হবে।

ঃঃ এছাড়া আমাদের সমাজে সাইকেল এর ব্যবহার বেশি হলে Traffic Jam কমে যাবে।

ঃঃ সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যুর হার কমে যাবে। প্রসঙ্গত বলে রাখি প্রতিদিন খবরের কাগজ খুললেই আমরা দুর্ঘটনায় মৃত্যুর সংবাদ পড়ে থাকি। কিন্তু সেখানে পায়ে হাঁটা মানুষজন বা সাইলের

আরোহীর মৃত্যুর সংবাদ তুলনামূলকভাবে অনেক কম।

ঃঃ বায়ুদুষণ কমে যাবে।– এ সবের ফলবশতঃ মানুষের সাথে সাথে পরিবেশের স্বাস্থ্যও ভালো থাকেব। এ বিষয়ে কোনোও দ্বিমত নেই যেম পরিবেশ দূষণের একটি কারণ হল যানবাহন। যেভাবে পরিবেশে Co_2এর পরিমাপ বাড়ছে, কে বলতে পারে ২০৪০–২০৫০ সালে মানুষকে ঘর থেকে বেরোনোর আগে অক্সিজেন মাস্ক নিয়ে বেরোতে হবে না!

এসবের পরেও বলতে হবে সাইকেল-এর ব্যবহার বাড়ানোর জন্য প্রশাসনকেও এগিয়ে আসতে হবে। অবশ্য আমাদের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্কুলে ছেলেমেয়েদের বিনামূল্যে সাইকেল প্রদান করেছেন। যার ফলে একদিকে যেমন বহু দুঃস্থ ছেলেমেয়ের হাতে বাহন হিসাবে সাইকেল এসেছে। অন্যদিকে, তেমনি তাদের অজান্তেই তাদের স্বাস্থ্যের উন্নতিও ঘটেছে। আর স্বাস্থ্যের ওপরইতো নির্ভর করে শিক্ষা। তাই মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর এই পদক্ষেপ অবশ্যই প্রশংসনীয়। তবে অবশ্যই সাইকেল চালানোর জন্য রাস্তায় আলাদা ট্র্যাক গড়ে তুলতে হবে যাতে সাইকেল আরোহীরা মোটর সাইকেল ও মোটরকার এর মধ্যে পড়ে পিষে না যায়। প্রসঙ্গত বলি, উত্তরপ্রদেশ এর বিভিন্ন শহরে ইতিমধ্যেই হয়েছিল। কিন্তু ট্র্যাকগুলি কব্জা করে রেখেছে পান বিড়ির দোকান।

সবশেষে বলি, বর্তমানে প্রায় প্রতিটি ঘরেই সাইকেল অবশ্যই রয়েছে। কোনও কোনও ঘরে তো সাইকেলের সংখ্যা একাধিক, তাই বেশি দূরত্ব না হলেও স্বল্প দূরত্বের জায়গায় বাহন হিসাবে আমরা যদি সাইকেল ব্যবহার করি অর্থাৎ সাইক্লিং কে যদি আমরা ভালো অভ্যাসে আনতে পারি তাহলে আমাদের ও পরিবেশ-স্বাস্থ্যের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সুন্দর হয়ে উঠবে।

)(

"বুদ্ধিমানেরা কোনোকিছু প্রথমে অন্তর দিয়ে অনুভব করে, তারপর সে সম্বন্ধে মন্তব্য করে। আর নির্বোধেরা প্রথমেই মন্তব্য করে বসে এবং পরে চিন্তা করে"। –হযরত আলী (রাঃ)

EDUCATION THOUGHTS OF SWAMI VIVEKANANDA AND ITS IMPLICATIONS IN OUR EDUCATIONAL SYSTEM

Sumanta De, Guest Teacher, Sabrakone Govt. PTTI

INTRODUCTION

India has had from time immemorial a strong sense of cultural unity. Swami Vivekananda was the one who revealed the true foundations of this culture and was able to define and strengthen the sense of unity as a nation. He gave Indians proper understanding of their country's great spiritual heritage and thus gave them pride in their past. He pointed out to the Indians the drawbacks of western culture and the need for India's contribution to overcome these drawbacks. Thus he made India a nation with global mission.

Swamiji strengthened India's nationalist movement by implanting a sense of unity, pride in the past and sense of mission. Several eminent leaders of India's freedom movement have acknowledged their indebtedness to him. Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of Independent India wrote. "Rooted in the past and full of pride in India's prestige, Vivekananda was yet modern in his approch to life's problems, and was a kind of bridge between the past of India and her present....His mission was the service of mankind through social service, mass education, religious revival and social awakening through education" Netaji Subhash Chandra Bose remarked, " Swamiji harmonized the east and the west, religion and science past and present. And that is why he is great. Our countrymen have gained unprecedented self-respect, self-reliarice and self-assertion from his teachings".

Swamiji's unique contribution to the creation of new India was to open the minds of Indians to their duty to the downtrodden masses. He spoke about the role of labouring classes in the production of country's wealth. He was the first religious leader in India to speak for the masses, formulate a definite philosophy of service and organize large-scale social service.

CONCEPT OF EDUCATION

Swami Vivekananda's education philosophy is based on his generel philosophy of life. He says, "education is the manifestation of the divine perfection already within man". Being a vedantist, Swamiji advocates that Atman dwells within everone. To realize the self, the perfection of God in man is the goal of true education. He believed in the development of inner powers. He was of the opinion that book learning is not education. He considered education as the training by which the current and expression of will are brought under control and become beautiful.

Education is spontaneous and positive. To Vivekananda education is life-building assimilation of ideas. He says, "If you have assunilaied five ideas and made them as your character, you have more education than any man who has got by heart the whole library. If education were identical with information, the libraries

would be the greatest sages in the world and encyclopedias the greatest Rishis."

Swamiji was of the opinion that education must suit the needs of the child. He says. "Their needs should be determined in terms of tendencies inherent in children and not accroding to what the parents of the children think." He emphatically adovocated the spread of universal mass education as India lives in her cottages. Without mass education the desirable socio-economic changes in our country is not possible. He considered education as the birth right of every humanbeing. It is a biological, social, economic and spiritual necessity. He was in favour of women education. Their uplift and welfare was a part and parcel of his basic philosophy.

As regards medium of education Vivekananda strongly advocated the mother-tongue. He wanted to Indianise the Indian education. He was a revivalist of Indian cultural traditions and values. He pleacledf that education must develop a strong sense of patriotism and nationalism in the minds of the students.

AIMS OF EDUCATION

Vivekananda considers education as part of human life. He observes: real education is that which enables one to stand on one's own feet. Regarding the aim of education, Swamiji says, "the end of all education, all training should be man making". He further says, "Education is not the amount of information that is put into your brain and runs riot there undigested all your life. We must have life building, man making, and character making assimilation of ideas". He oppined that, "education should lay proper emphasis on creativity, originality and excellence." The main aim of education according to him is the development of a strong moral character and not merely the feeding of information to brain. The education should enable one to realize one's self. Before that it should create self confidence. Education should take man to freedom, to liberty, to salvation. He said. "Through education, we should gradually reach the of universal brotherhood by finging down the walls of separation and inequality. In every man, in every animal, however weak or miserable, great or small, resides the same omnipresent and omniscient soul. The difference is not in the soul but in the manifestation". His aims of education can be classified into two heads: proximate and ultimate.

> Proximate aims of education
* Physical development
*Mental development
*Developoment of character
* Observation of Brahmacharya for concentration
* Vocational aim
> Ultimate aims of education
* Development of personality
* Faith in one's own self
* Developing shradha

* Developing a spirit of renunciation
* To promote universal brotherhood

METHODS OF TEACHING

Swamiji laid stress on meditation as a methood of attaining knowledge. He advocates that since the human mind is perfect in itself, there is no necessity for it to receive knowledge from outside. Hence learning is nothing but a process of discovery of knowledge within the mind. However he has suggested following methods of teaching to be followed in a teaching learning situation.

Concentration Methods: Swamiji considers concentration as the only methood of attaining knowledge. It is the key to the treasure house of knowledge. Concentrate on the subject matter of instruction. He believed that Brahmacharya is necessary for developing the power of concentration. He said, "Brahmacharya should be the burning fire within the venis".

Methods of Realization: Vivekananda considers realization as the chief aim of life. He advocated yoga as the most ideal methood of realization. Yogas are four in number. 1. Karna yoga, 2. Bhakti Yoga, 3. Raja Yoga and 4. Jnana Yoga. The scope of all these Yogas is one and the same–removal of ignorance and enabling the soul to restore its original nature.

Discussion and Contemplation Methood: Borrowing the idea from ancient Indian gurukula system of deucation Vivekananda also advocated discussion and contemplation to be followed in education.

Imitation Methood: Children like to imitate the activities of others. Vivekananda, therefore, advocated utilizing such qualities of children for educational purposes. A teacher should present higher ideals and nobler patterns of behavior before the children to help them to imitate such activities for the formation of their character and personality.

Individual Guidance and Counselling: Vivekananda advocated the methood of individual guidance and counselling in the teaching learning process to develop divine wisdom.

Lecture Methood: Spiritual ideas are abstract ides. It becomes difficult on the part of a child to understand spiritual doctrines. Therefore Vivekananda advocated for the introduction of lecture methood to explain the spiritual ideas in a simple way to the students.

Activity Method: Swamiji accepted learning through activities as an ideal method of teaching. It can provide direct exprience to the children. He advocated that activities like singing, story telling, drama and dance should be performed by the students. He also advocated for the introduction of activities like excursions, camps etc., to help the students to understand the value of social service.

ROLE OF TEACHER

Vivekananda advocates that the nature of human mind is such that. "no one ever really is taught by another. Each of us has to be teacher himself". Within man is all knowledge and it requires only an awakening and that much is the work of the teacher. They have to do only so much for the students that they may learn to apply their own intellect to the proper use of their hands, iegs, ears, eyes etc., and finally everything will become easy. He said, "Like fire in a piece of flint, knowledge exists in the mind: suggestion is the friction which brings it out." He wants that a teacher should be like a father, who will give the students their spiritual birth and show them the way to eternal life. He should initiate the students to practice the essential virtues of brahmacharya and shraddha. To quote Swamiji, "true teacher is he who can immediateky come down to the level of the students and transfer his soul to the students' soul".

Vivekananda has a great appreciation for the 'Gurugriha Vasa'. True education is only possible through intimate personal contact between the teacher and the taught. He states taht, "My idea of education is personal contact with the teache– 'gurugraha vasa'. Without the personal contact of a teacher, there would be no education." Swamiji advocates that the teacher should possess the following qualities.

> A teacher must be a tyagi or a man of renunciation.
> He should act like a substitute of the parents for the students. He should have personal love for the students, which will help him to transmit spiritual force.
> He should come down to the level of the students and should have sympathy for his students.
> He should have very high character and should be sinless.
> He must be pure in mind and heart.

MAN-MAKING EDUCATION

Swamiji does not accept information as education. He advocates a type of education, which is man-making, life-building and character-formation. Education should also help in the development of originality. It should unfold all the hidden powers in man. A child should also help in the development of originality. It should unfold all the hidden powers in man. A child should learn to accept pleasure and pain, misery and happiness as equal factors in the formation of charater. Man-making education is inherent in character development as well as vocational development. What India needs today is character and strengtherning of the will. This can be achieded through man-making education.

Man-making education includes physical and health education. He was also greatly concerned about the proper care of the body and the healthy development of one's physique. He urged, "Be strong my young friends, that is my advice to you.

You will be nearer to heaven through football, than through the 'Gita'. These are bold words but I have to say them to you. I know where the emphasized repeatedly, "Strength is goodness. Weakness is sin".

Following are the chief elements of man-making concept for which education should be directed to:

> An indicidual must fully understand the Vedant philosophy, which considers that the ultimate goal of human life is to attain Unity with the creator.

> Development of the spirit of service to the fellow beings, since service to man is equated with devotion to God.

< Development of a respectful attitude for all religions. Essential elements of all religions are the same. No religion is inferior to other religion.

> The concept wants man to imbibe love for all and hatred for none.

> Attainment of knowledge of science and spirituality.

> Development of a rational attitude in life without the cultureal boundaries of East and the West.

> Attainment of social equality.

> Development of such individual who are ethically sound, intellectually sharp, physically strong, religiously liberal, socially effcient, spiritually enlightened and vocationally self-sufficient.

CONCLUSION

Vivekananda was a great educationalist and he revolutionizes almost the entire field of education. His educational views were immensely influenced by the eternal truths of Vedanta. He inspired the millions of Indian youths by his revolutionary ideas of education. He gave the clarion call, "Arise, awake and stop not till the goal is reached". He infused a new spirit in the national blood. He strongly advocated national education on national lines and based on national cultural tradition.

His great contributions in the field of education include self-knowledge, self-reliance, concentration, universal mass education women's education, physical education, man-making education, character building education, education through the medium of mother-tongue, religious and moral education, value education, selfless dedicated teacher etc. The teaching of Swamiji are of great importance in the reorganization of our present system of education.

Purity, Patience & Preseverance are the three essentials to success and, above all, Love.

–Swami Vivekananda

জীবনের স্বাদ

–সুব্রত পাত্র (২য় বর্ষ)

মানুষ পৃথিবীতে বেঁচে থাকে কোনো স্বপ্ন নিয়ে, কোনো ইচ্ছাপূর্ণ করার আকাঙ্খায় কিংবা সংসারের মোহমায়ায়। কিন্তু এসব কিছু যদি জীবন থেকে ম্লান হয়ে যায় তবে বেঁচে থাকাটায় অর্থহীন হয়ে পড়ে। আমার জীবনে এমন পরিস্থিতি একবার নয়, বহুবার এসে আমায় দুমড়ে দিয়ে চলে গেছে। ব্যর্থ হয়ে শুধু পড়ে রয়েছে আমার এই বেকার দেহটা। এই ফাঁকে আর একটা কথা বলা জরুরী, আমি অবিবাহিত, আমার সংসার নেই। এই পৃথিবীতে আমি সম্পূর্ণ একা। ছোটোবেলাতেই মাকে হারিয়ে এই পৃথিবীর কঠিন মাটিতে হয়ে পড়েছিলাম নিঃসঙ্গী। আমার বাবার পরিচয় আমার অজানা। আমার মা কুমারী অবস্থাতেই আমার জন্ম দেন। এই সভ্য সমাজে তিনি স্বাধীনতা খুঁজে পাননি বরং পেয়েছেন শুধুই লাঞ্ছনা। আমার শিক্ষা জীবনের কথা বলছিনা। কেননা ফুটপাথের পাশে পড়ে থাকা কচি-কচি মুখগুলোর দিকে তাকালেই তার উদাহরণ উঠে আসবে। যখন প্রথম পড়তে শিখি তখন আমার বয়স পনেরো বছর। আমার করুন মুখে শিক্ষার আগ্রহ দেখে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক মহাশয় আমাকে নিয়ে গিয়ে স্কুলে ভর্তি করে দিলেন। আমি তখন সম্পূর্ণ নিরক্ষর। আমার সহপাঠী যারা ছিল তারা আমার চেয়ে দশ বছরের ছোটো। আমাকে দেখে তাদের লুকানো হাঁসি প্রত্যক্ষ করে আমার ভারী লজ্জা লাগত। তবে একমাসের মধ্যে বাংলার সমস্ত স্বরবর্ণ, ব্যঞ্জনবর্ণ এমনকি ইংরেজী অ্যালফাবেটগুলো পর্যন্ত ওষ্ট্যগত করে তাদের ছাপিয়ে উচ্চস্তরে প্রমোশন পাই। বহুকষ্টে ভিটে-মাটি বিক্রয় করে B.A-র পার্ট শেষ করলাম। ভেবেছিলাম চাকরী করব, সরকারী চাকরী। রোজগার করে একটা নতুন সংসার গড়ব। কিন্তু হায়রে কপাল! চাকরীর টান পড়নে এত ভীড় যে আমি সেখানে নগন্য। সবাই গ্র্যাজুয়েট পাশ করে বসে আছে। সবাই ভালো ভালো নাম্বার নিয়ে চাকরির দরজার কাছে লাইন দিয়েছে। আগেই বলেছি আমি তেমন কিছু বুদ্ধিমান নই। শিক্ষার আলো আমার শুধু আলতোভাবে স্পর্শ করেছে। B.A তে আমার মোট নাম্বার হয়েছিল মাত্র 35%, যাকিনা আধুনিক সভ্যতাই খুবই নগন্য। তাই চাকরির সন্ধানে যেখানেই যাই বলে দেয় কর্ম খালি নেই। যে আশায় ভিটে-মাটি, জমি জমা সব কিছু বিসর্জন দিলাম সেই আজ মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। ভীষণ অভিমান হল, ঘৃণা হল নিজের প্রতি। শিক্ষার এই মূল্য! এর চেয়ে মুদীর দোকানে কাজ করাও শ্রেয় হত। 'কি হবে এই তুচ্ছ জীবন রেখে'। ঠিক করলাম দোকান থেকে মারাত্মক বিষ এনে এই জীবন এই সভ্য সমাজের প্রতি নিবেদন করব। দরজা বন্ধ করে এক নিশ্বাসে বিষ ভোজন করতে যাব এমন সময় কপাটে দুটো টোকা পড়ল। তারপর আবার দুবার। ভেবে নিয়েছি এ জীবন শেষ করে দেব তবে এই আগন্তুকটিকে তা একবার দেখা দরকার। দরজা খুলে দেখি মালতী, আমার কলেজের সবচেয়ে প্রিয় এবং কাছের বান্ধবী। সত্যি কলেজে মালতীকেই একমাত্র আপন মনে হত; কেন জানিনা তবে খুব ভালো লাগত মালতীকে। তারপর কলেজ শেষ আর আমাদের সাক্ষাতও শেষ। মালতীকে দেখে একটু আশ্চর্যই হয়েছিলাম, আবারও যে কোনোদিন তার সাথে দেখা হবে ভাবিনি। আমাকে দেখে মালতী বলে,–"কিরে সুমন্ত চিনতে পারছিস, নাকি ভুলে গেলি"। মালতীর সেই পুরানো ভাসমান কণ্ঠ শুনে সত্যই মনে এক অনন্য অনুভূতির উদ্বেগ হয়েছিল যা বলে

বোঝানো সত্যই কঠিন। আমি বললাম,–"আরে মালতী, এখানে কীভাবে ? মালতী একটু হেঁসে বলল– "পাশের বাজারেই এখন থাকি, ওখান থেকে M.Aকরছি, তোকে বাজারে দেখতে পেয়ে খবর করে এখানে আসি"। ভাবলাম আমার ব্যর্থ জীবনের কথা মালতীকে বলব কিন্তু তা গলায় এসে আটকে গেল কিছুতেই কণ্ঠ থেকে বাহির হলো না। মালতী আমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ফিরে গেল। যাবার সময় বলে গেল বাজার সেরে পরে সে আবার আসবে। ক্ষণিকের জন্য মনে হয়েছিল জীবনে আনন্দ আছে কিন্তু কোনো অজানা শক্তি বার বার বুক চাপড়িয়ে বলছিল, "কি করবি তুই বেকার, তুচ্ছ সমাজের এক আবর্জনা মাত্র" মাথা ক্রমশ গরম হয়ে যাচ্ছিল। মনেও অস্থির বেদনার রাশি রাশি তথ্য উঠে আসছিল। বিষের শিশি মুখে পুরে অর্ধেকটা কণ্ঠে ঢেলে দিলাম। মাথা ঝিম ঝিম করতে লাগল। শ্বাসনালীকে কে যেন আটকে রেখে ঝাঁঝালো কোনো বাতাস ঢেলে দিয়েছে। সব কিছু ক্রমশ আবছা.....আবছা হয়ে গেল।

যখন সংজ্ঞা ফিরে পাই তখন দেখি হাসপাতালের বেডে শুয়ে আছি। পাশে বসে আছে মালতী। মালতীই আমাকে হাসপাতালে নিয়ে আসে। আমি জ্ঞান হারাবার কিছু পরেই মালতী আবার ফিরে আসে তার ফেলে যাওয়া ব্যাগটা নিতে। দরজা খোলাই ছিল। এসে আমার এই অবস্থা দেখে স্থানীয় প্রতিবেশীদের ডেকে হাসপাতালে নিয়ে আসে। আমি যেদিন জ্ঞান হারিয়ে ছিলাম সেদিন ছিল শুক্রবার সংজ্ঞা ফিরে পাই রবিবারে, অর্থাৎ গত ২৪ ঘন্টা যে আমার মধ্যে কি কি হয়েছে তা আমার অজ্ঞাত। ডাক্তারবাবু এসে আমায় ধমক দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন আমার বিষ খাবার কারণ এবং বর্তমান শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে। যাবার আগে মালতী কীভাবে সেবা-সুশ্রুষা করে আমায় সুস্থ করে তুলল তার একটা মাঝারি প্রবন্ধ শুনিয়ে গেলেন। এই নতুন জীবনে আবার নতুন করে মরতে একবারও ইচ্ছে হচ্ছিল না। মৃত্যু যে কি ভয়ানক বীভৎস তার পরিচয় আমি পেয়েছি। মালতী সম্পূর্ণ সত্যটা জেনে আমায় আপন করে নিয়েছিল। আমিও অন্তরের থেকে ভালোবেসে ফেলেছিলাম তাকে। ভালোবাসার মধুর কাহিনি গোপনেই থাক কেননা তা শরতের মেঘের মতোই ক্ষণস্থায়ী। কীভাবে আমাদের সুদৃঢ় সম্পর্কটা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল তা কিছুটা হোক বলা দরকার। মালতী M.A পাশ করে একটা উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা পদে নিযুক্ত হয়। আমি বেকার, নিকম্মা পুরুষ লেবার, খেটে যা রোজগার হয় তাতে কোনোমতে নিজের পেটটুকু চলে যায়। মালতীর জন্য দুবেলা খেটে টাকা আয় করে খরচ জোগিয়েছি। এখন মালতী শিক্ষিকা তাই আর বাড়তি খাটতে হয়নি। মালতী চাকরি পায় অন্য জেলায়। সেখান থেকেই সে চাকরি করছে। মালতী চাকরি পাবার পর থেকে তাঁর সাথে পাঁচমাস যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। আমি জানিও না সে কোন স্কুলের শিক্ষিকা। তাই তাকে খুঁজতে যাবারও কোন নির্দিষ্ট দিক নেই। তবে একদিন মালতী আসবে আমাকেও সাথে নিয়ে যাবে বলে ভেবে রেখেছিলাম। কিন্তু মালতী নয় মালতীর নিজের হাতের লেখা একটি চিঠি পেলাম। তাতে আমায় আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে ঠিকই তবে তার সাথে বাসা বাঁধতে নয়, তার বিয়ের ভোজ খেতে। এক বিলেত ফেরৎ ডাক্তারের সাথে প্রেম করে সে বিয়ে করছে। পুরানো মুছে যাওয়া স্রোত যেন আবার ধেয়ে এসে বুকে আছাড় দিয়ে চলে যায় আমায় একাকি করে। জীবনের মানে হয়ে যায় শূন্য। দুঃখের সেই স্রোতে মন একাকি ভেসে চলে। একের পর এক আঘাত সহ্য করতে করতে যখন অন্তিম বেদনার অপেক্ষায় পাগলের মতো ঘুরে ঘুরে হয়ে পড়েছিলাম ক্লান্ত, ঠিক তখনই এক অদ্ভুত আকর্ষণ আমায় দিশে দেখায়।

টেনে তুলে অন্ধকারের বন্ধকরা যন্ত্রণা কঠোর থেকে। জীবনের আসল মূল্য যে কত কঠিন কত বাস্তব সত্যতায় পরিপূর্ণ তা তোমাদের কি করে বোঝাই। ভিক্ষা করে অথবা কারো অনুদানে বেঁচে থাকা আমার স্বভাবে নেই। এমন জীবনের চেয়ে নিষ্প্রাণ দেহ অনেক ভালো। তাই স্থীর করলাম সমুদ্রের বিশাল জোয়ারের ঢেউরের সাথে নিজেকে বিসর্জন দেব। কষ্ট যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে যখন অন্তিম বেদনা প্রাপ্ত হব তখন এ জীবন সম্পূর্ণ শান্ত হবে। ভরা কোটালের দৈত্যের ন্যায় জলরাশি আমায় নিয়ে চলল দিগন্তের সাথে সাক্ষাৎ করাতে। তার অতল গ্বহরে আমায় নির্বাসন দিবে বলে অজস্র জলরাশির মধ্যে আমায় বন্দি করে। জল ছাড়া মাছ যেমন ডাঙায় ছটপট করে ঠিক তেমনই ছটপট করতে লাগলাম। তারপর পিছন থেকে বিশাল দানবাকৃতির এক ঢেউ এসে আমায় সজোরে আঘাত করে দুরে ছুড়ে দেয়। আমি জ্ঞান শূন্য হই।

কিন্তু অদৃষ্টের কি অদ্ভূত পরিহাস। এক জেলে মাছ ধরতে গিয়ে আমার অসাড় দেহ তুলে আনে। দেহে প্রাণ আছে দেখে পেটে চাপ দিয়ে সমুদ্রের নোনা জল বের করে নিয়ে আসে। নিয়ে যায় বাড়িতে। যখন সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠি সেই উদার মহান জেলে লোকটি আমার ব্যর্থ জীবনের অসম্পূর্ণ কাহীনি শুনেন। তবে গুনী ব্যক্তিদের মতো ভালো মন্দের উপদেশ তিনি দেননি বরং আরও আপন করে নিজের সন্তান ভেবে যত্ন করেছিলেন। নিজের ছেলের মতোই হাতে ধরে নতুন কাজ শেখান। একটা ছোটো মাছের দোকান খুলে বসি। তারপর একদিন শুরু করে দিলাম মাছের ব্যাবসা। ইলিস, চিংড়ি, রুই, কাতলা, ভেটকি, সুটকি নানা ধরনের মাছ। আমার সৎ ব্যবহারের জন্যই হয়তো এই মাছের চাহিদা প্রচুর। বিদেশ থেকেও এই মাছের চাহিদা অনন্য। মাছ বিক্রয় করে এখন যা আয় হয় তাতে অর্থের জন্য আর অনর্থ ঘটবে না তা জোর গলায় বলতে পারি।

)(

"এ সংসার তাঁর লীলা, খেলার মত। তিনি লীলাময়ী, ইচ্ছাময়ী, আনন্দময়ী। লক্ষের মধ্যে একজনকে মুক্তি দেন।"

–শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ

জাদুকর ও নিখোঁজ রহস্য

–মনোজ ভট্টাচার্য্য (শিক্ষক, ছাতনা চন্ডিদাস বিদ্যামন্দির)

স্কুল ছুটির পর বাস ধরতে এসে বাসস্ট্যান্ডে সেই অদ্দুধ লোকটিকে তিতির দেখতে পেল। বুঝতে পারল, আজ আবার একজন কেউ নিখোঁজ হবে।

রহস্যময় মানুষটি মাঝে মাঝেই এখানে টাসে। কোবরেজি দাঁতের মাজন, ত্রিফলাবটিকা, ধূপ এইসব বিক্রি করে। লোক জড়ো করতে সে ম্যাজিক দেখায়।

ঐ সে কাঁধের নীল ঝোলা নামিয়ে খুলতে শুরু করেছে। অবাক করে দেওয়া ম্যাজিক দেখাতে দেখাতে সে তার ঝোলা থেকে কিছু একটা বিক্রি শুরু করবে এক্ষুনি। সবশেষে, বিক্রি হয়ে গেলে, লোকটি যখন নীল ঝোলা গুছিয়ে ধীর পায়ে রাইসমিলের পাশ দিয়ে সরু রাস্তাটা ধরে গ্রামের দিকে হাঁটা শুরু করবে, তিতির জানে, তখন জাদুকরের পিছনে যেতে বাধ্য হবে আরেকজন– যার সেদিন নিখোঁজ হবার কথা।

এই নিখোঁজ রহস্যের কথা তিতির জানলেও সে কাউকে বলে না। শুধু মৃদু হাসে। মাঝে মাঝে যখনই কোউ নিখোঁজ হয়, দু-একদিন তা নিয়ে জোর আলোচনা চলে। বাসস্ট্যান্ডে, বাজারে, চায়ের দোকানে, স্কুলে।

মজা হল, নিখোঁজ ব্যক্তিটি প্রতিক্ষেত্রেই কয়েকদিনের মধ্যেই ফিরে আসে। কেউ কেউ সেদিনই। কারো কোন ক্ষতি হয় না। সবাই অবাক হয়ে লক্ষ করে থুঁতথুঁতে, খিটখিটে, বদমেজাজী, গোমড়ামুখো লোকগুলিই বেছে বেছে নিখোঁজ হচ্ছে। তবে ফিরে এসে কোথায় কিভাবে হারিয়ে গিয়েছিল, তা তারা মনে করতে পারছে না।

তিতিরের কিন্তু সব মনে পড়ে। সেও একদিন একইভাবে হারিয়ে গিয়েছিল।

সেবছর তার পরীক্ষার ফল ভাল হয়নি। পড়াশুনো করতেও তার আর ভাল লাগছিল না। বইয়ের পড়া সে কিছু বুঝতে পারে না। সবকিছু কেমন নীরস আর একঘেঁয়ে লাগে। চারপাশটা যেন বিষন্ন, ক্লান্তিকর আর অর্থহীন।

নিখোঁজ হবার দিনে সকাল থেকেই তার মন ছিল ভার হয়ে। স্কুল পালিয়ে, মুখ গোমড়া করে ঘুরতে একসময় সে ভিড়ের মধ্যে ম্যাজিক দেখতে দাঁড়িয়ে পড়ে। স্পষ্ট মনে আছে তিতিরের, জাদুকর-লোকটি সেদিন দাঁতের মাজন বেচছিল।

লোকটি ভারি রসিক। খুব হাসায় আর মজার মজার প্রশ্ন করে।

সেদিন বলল, দাঁতে হলুদ ছোপ থাকলে হাসিতে বেশ খোলতাই আসে না। অনেকে দাঁতে দাগ আছে বলে হাসেই না। রামগরুড়ের ছানা হয়ে বসে থাকে।

রামগরুড়ের ছানার প্রসঙ্গে এসেই জাদুকর প্রশ্ন করল একটা। প্রশ্নটা অদ্ভুত ধরণের। রামগরুড়ের ছানাদের না কী কী ?

আরও একবার প্রশ্নটা সবাইকে শুনিয়ে দিয়ে, কারুকার্যময় নীল জোব্বা-পরা সেই জাদুকর তার নীল উষ্ণীষের গোলাপি পালক কাঁপিয়ে উত্তরটা নিয়ে দুহাতে লোফালুফি শুরু করে দিল যেন।

সব্বাই চুপ। একটা ভিড় বাস এসে দাঁড়িয়ে হৈ চৈ শুরু করবার আগেই চকিতে দু'হাত

উপরে তুলে যেন আকাশ থেকে সৃষ্টি করল গোবদা গোবদা গোমড়ামুখো দুটো পুতুল। তারপর ফিসফিসিয়ে অথচ সবাই শুনতে পাচ্ছে এমনভাবে উচ্চারণ করল, লব গরুড় আর কুশ গরুড়।

উত্তরটা যারা বুঝতে পারেনি তারাও পুতুলের গোমড়ামুখ দেখে হাসছে। কে একজন ভিড়ের মধ্যে ব্যাখ্যা শুরু করেছে। রামচন্দ্রের যেমন দুটি ছেলে, লবচন্দ্র আর কুশচন্দ্র, রামগরুড়ের তেমনি।

সব মাজন বিক্রি করে জাদুকর ইতিমধ্যে তার ঝোলা গোটাতে শুরু করেছে। সেই মুহূর্তেই তিতির জাদুকরের প্রতি এক আশ্চর্য অনুভব করে।

জাদুকর যেমন চুম্বক আর তিতির লোহার পেরেক। চুম্বক কিভাবে লোহাকে আকর্ষণ করে, বিজ্ঞানের ক্লাশে স্যার একদিন দেখিয়েছেন। জাদুকর তেমনিভাবেই তিতিরকে আকর্ষণ করছে। রেজাল্ট খারাপ, মন খারাপ, চারপাশের হতকুচ্ছিত জগৎ সব পিছনে ফেলে তিতির নীল জোব্বাকে অনুসরণ করল।

পথ চলতে চলতে জাদুকর বিচিত্র সব কথা বলে আর তিতির মন্ত্রমুগ্ধের মতো তা শোনে। মেঠো পথে তারা হাঁটছে। দূরে শুশুনিয়া পাহাড়।

সকালে বৃষ্টি পড়ছিল। এখন বিকেল। এক-একবার ছায়ায় ঢাকা পড়ে যাচ্ছে তাদের চারপাশ। আবার পরক্ষণেই ঝকমকিয়ে রোদ উঠছে। আকাশের কোন কোন অংশে মেঘ। কিন্তু যেখানে মেঘ নেই, সেখানে আকাশ গাঢ় নীল। এত নীল যে, কাঁচের মার্বেলের ভিতরের আশ্চর্য নীল ফুলের কথা মনে করিয়ে দেয়।

একটা গিরগিটি বিকেলের এই রোদছায়ার খেলা দেখে খুব খুশি। মাঠের আলের উপর ঘাড় নেড়ে নেড়ে নেচে বেড়াচ্ছে। মাথায় খাঁজ-কাটা লাল ঝুঁটি।

জাদুকর বলল, বলতো কে যাচ্ছে ?

–ও তো গিরগিটি!

জাদুকর হাসে। বলে শুধু গিরগিটি ? আর কিছু নয় ? ওরকম খাঁজকাটা-শিরস্ত্রাণ পরা কোন ছবি দেখিনি কখনো ?

তাইতো, তাইতো! তিতিরের মনে পড়ে যায়। ও তো গ্রীক সৈনিক-শিরস্ত্রাণ পরে যুদ্ধে চলেছে বুঝি ?

ওরা তুজনেই হাসে। হাসতে হাসতে পথ চলে। তারা দুজনে এখন হাঁটছে পাড়াহের দিকে। শুশুনিয়া পাহাড়ের বড় ঝর্না, যাকে এলাকার মানুষ ধারা বলে, সেটা ছাড়াও আর একটা ছোট ঝর্না রয়েছে উত্তর দিকে। সেই ঝর্নার কাছেই জাদুকরের ঘর।

তখন লাল সূর্য অস্ত যাচ্ছে। সারাদিন ছোটাছুটির পর এখন খুব শান্তভাবে বসে পড়ে সেই অস্তগামী সূর্যের আশ্চর্য শোভাটুকু উপভোগ করছে দলছুট এক হাতি। তেমনিই দেখছে শুশুনিয়াকে। এক্কেবারে একাকী একটা পাখি নীরবে উড়ে গেল। উড়তে উড়তে দূরে পাহাড়ের চূড়ার উপর আকাশের বুকে কালো একটা বিন্দুর মতো হয়ে আসছে ক্রমশঃ। খুব ভাল লাগছে তিতিরের। জাদুকরের সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে তার মাথা পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে, সে বুঝতে পারে।

পাখিটা ডানা নেড়ে নেড়ে আমাদের ডেকে গেল না, ঠিক যেমন হাত নেড়ে কেউ কাউকে ডাকে ? প্রশ্ন করে তিতির।

ডাকলই তো! হেসে জাদুকর ঘাড় নাড়ে। পাখিটা আমাদের পাহাড়ে যেতে বলল।

গ্রামের পর গ্রাম ছাড়িয়ে, একটা নদী পেরিয়ে একসময় তারা পৌঁছে গেল শুশুনিয়া কোলে জাদুকরের গ্রামে। বর্ষার সন্ধ্যে। ব্যাঙ ডাকছে অজস্র। কট্‌কটে ব্যাঙ, ছাগুলে ব্যাঙ, হাঁস ব্যাঙ। জাদুকর হাসতে হাসতে বলে, দেখেছ কত ছাগল আর হাঁস রাত্রিতে চরতে আসে এখানে! কারা এত পোষে!

জাদুকরের বৌ তিতিরের মায়ের মতোই দেখতে। তবে তার মা কোন্‌খানে যেন ভারী দুঃখী, বড্ড বিষণ্ন, ভীষণ একলা। আর জাদুকরের বউরের হাঁটাচলা, কথা বলা, কাজকর্ম করা সবকিছুর মধ্যে কেমন একটা খুশির গন্ধ আছে। তিতিরের কথা জাদুকরের কাছে শুনে কী মিষ্টি করেই না বলল, পরীক্ষার ফল ভাল হয়নি তোমার ? বেশ মন দিয়ে পড়, আসছে বছর দেখবে, ঠিক ভাল হবে।

তিতিরও বুঝতে পারে, এবার পড়াশুনায় তার মন বসবে। কী একটা পরিবর্তন হয়ে গেল তার মধ্যে। এতদিন চারপাশটা তার চোখে পড়লেও সে ভাল করে দেখেনি, চারাপাশের কথাবার্তা কানে এলেও সে ঠিকমতো শোনেনি। এখন যেন সে সবকিছু স্পষ্টভাবে দেখতে শুনতে পাচ্ছে। এখন সবই তার ভাল লাগছে খুব।

মাটিলেপা পাথরের দেওয়ালের ঘর জাদুকরের। খড়ের চাল। জাদুকরের ছেলে সেই ঘরের এককোণে হ্যারিকেন জ্বেলে পড়তে বসেছে। ঘরের সামনে ছোট্ট উঠোন। উঠোনের বেড়ার চারপাশে ছোট বড় অজস্র গাছপালা। সেখান থেকে কত রকমের রং-বেরঙের পোকা আসছে হ্যারিকেনের আলোয়। একটি পোকা, আঃ কী উজ্জ্বল লাল রং, ঠিক যেন দিদির গয়নার বাক্সের ভেলভেট! জাদুকরকে সেকথা বলতেই, জাদুকর বলল, হ্যাঁ, হ্যাঁ ও তো ভেলভেট পোকাই!

জাদুকরের ছেলে এতক্ষণ ধরে শুঁয়োপোকা থেকে কিভাবে প্রজাপতি হয়, সেইসব কথা জোরে জোরে পড়ছিল। বেশ বোঝা যায়, ওর খুব ভাল লাগছে পড়তে। হঠাৎ ছেলেটি চেঁচিয়ে বলল, মা, সার্কাস! আজ আবার এসেছে।

তিতির দেখল, দুটো পালোয়ান গুবরে পোকা গোবরের একটা বল নিয়ে সার্কাসই দেখাচ্ছে বটে! পা দিয়ে বলটাকে ঠেলতে ঠেলতে তার হ্যারিকেনের পাশ দিয়ে পেরিয়ে যাচ্ছে।

মা এসে সেগুলো কাঠি দিয়ে ধরে বাইরে নিয়ে ফেলল।

খেতে বসেই কিন্তু হু হু করে কেঁদে ফেলে তিতির। তাদের ঘরে তার মা এতক্ষণ কান্নাকাটি করছে। বাবা চেঁচামেচি। লোকজন নিয়ে হয়তো খুঁজতে বেরিয়েছে।

তিতিরের কান্না দেখে তাড়াতাড়ি এঁটো হাত ধুয়ে জাদুকর ছেনি-হাতুড়ি নিয়ে বসল। সাদা পাথর কেটে কী অবিশ্বাস্য দ্রুততায় সে তৈরী করে ফেলল দুটি মূর্তি। দটোই তিতিরের। একটার মুখ গোমড়া, যেন প্রতিজ্ঞা করেছে কিছুতেই হাসবে না; অন্যটার হাসিমুখ, আর সে হাসি যেন আলোর মতো ছড়িয়ে পড়ছে।

জাদুকর মূর্তিদুটো তিতিরের সামনে নামিয়ে রাখল। তারপর স্নেহ আর মায়াভরা চোখে প্রশ্ন করল, কোন্‌টি পছন্দ তোমার, কোন্‌টি ?

তিতির প্রথম মূর্তিটিতে নিজের গোমড়ামুখ দেখে কান্না ভুলে হাসে। পরে তর্জনী দিয়ে হাসিতে উজ্জ্বল দ্বিতীয় মূর্তিটির ঠোঁট স্পর্শ করে!

গোমড়ামূর্তিটি বাইরের অন্ধকারে নিক্ষেপ করে দ্বিতীয় মূর্তিটি জাদুকর হাতের তালুর উপর দাঁড় করিয়ে বলে, তোমার সঙ্গে আমার বন্ধুত্বের স্মারক এটি – আমার কাছেই থাক।

মূর্তিটা রেখে জাদুকর তিতিরের পাশে এসে বসে। তারপরেই সেই নিখোঁজ রহস্যে কথা বলতে শুরু করে। জাদুকর বলে, জানো তো, ম্যাজিক দেখাতে গিয়ে তোমাদের চারপাশ থেকে গোমড়ামুখো, খিটখিটে, রাগী মানুষদের সম্মোহিত করে এখানে নিয়ে আসি।

জাদুকরের কথা শুনে তিতির জাদুকরের দিকে তাকায়। জাদুকর থামে না। বলে, ওরা আকাশ, পাহাড়, ঝর্না, পাখি এমনকি নিজেদের কথাও ভুলে গিয়েছে বলে আর হাসে না। এখানে এসে ওরা ঝর্নার স্নান করে। নীল আকাশের নীচে পাহাড়ের কোলে বসে পাথরের থালায় পায়েস খায়। তখন সবকিছু মনে পড়ে। ওরা আবার হাসতে শেখে।

হ্যারিকেনের মৃদু আলো পড়ছে জাদুকরের মুখে। সেই আলোয় জাদুকরকে খুব আপনজন বলে মনে হয় তিতিরের। ঠিক কার মতো যেন ? বাবার মতো কি ? কিন্তু বাবা তো এতখানি আনন্দ-ঝলমল নয়। তিতির বুঝতে পারে না। কখনো তার জেঠার কথা কখনো বা প্রিয় মাস্টারমশাইয়ের কথা মনে পড়ে। তার মনে হয়, ঐ জাদুকর খুব কাছের কেউ, খুবই নিকাত্মীয় তার।

জাদুকর আবার কথা বলতে শুরু করেছে। এখান থেকে ফিরে গিয়ে, কিভাবেনিখোঁজ হয়েছিল, সবাই ভুলে যায় সেকথা। তোমার মূর্তিটি রইল আমার কাছে। স্বপ্নে দেখা কিছু কথা যেমন মনে থাকে, তেমনই এখানের কিছু কথা তোমার মনে থাকবে, দেখবে।

পাথরের বাটীতে পায়েস খাবার ইচ্ছে তিতিরেরও ছিল। কিন্তু বাড়ির জন্য মন কেমন করায় জাদুকর তাকে সেই রাত্রেই বাড়ির সামনে পৌঁছে দিয়ে যায়। ফিরে বাবার সময় জাদুকর তিতিরের মাথার চুলের ভিতর আঙুল চালিয়ে স্নেহভরে বলে, তোমার চারপাশটাকে, আমাদের এই পৃথিবীটাকে খুব ভালবেসো। আর প্রাণভরে হেসো।

জাদুকরকে আজ আবার তিতির বাসস্ট্যান্ডে দেখতে পেল। বুঝতে পারল, আজ আবার একজন কেউ নিখোঁজ হবে।

জাদুকরের চারপাশে ভিড় বাড়ছে। রহস্যময় নীল ঝোলা খুলে সে অদ্ভুত অদ্ভুত ম্যাজিক দেখানো শুরু করেছে ঐ। ম্যাজিক দেখতে তিতির সামনে এগিয়ে যায়।

জাদুকাঠি ধরা হাত পাখির পানার মতো নেড়ে, চোখ বড় বড় করে জাদুকর আজ প্রশ্ন করল, সেই ভয়ঙ্কর প্রাণীটার নাম কী, যে উড়তে উড়তে আসে আর রক্ত চুষে খায় ?

জাদুকরের সামনাসামনি দাঁড়িয়ে ছিল স্কুলের একটি ছেলে। তিতির দেখে, ভয়ে আর উত্তেজনায় ছেলেটির মাথার চুল খাড়া হবার মতো অবস্থা। খুব গল্পের বই পড়ে ছেলেটি। সে-ই উত্তর দিল, ভ্যাম্পায়ার-ভ্যাম্পায়ার ব্যাট!

ম্যাজিক দেখতে দেখতে, সদ্যকাটা একগোছা লটারির টিকিট এক-একবার মাথায় ঠেকাচ্ছিল একজন লোক। হঠাৎ এরকম প্রশ্ন শুনে সে বুঝি হকচকিয়ে গেল। তারপর কেশে, পানের পিক ফেলে, বেজায় বিরক্ত হয়ে গোমড়ামুখে বলে উঠল, রাক্কুসী!

তিতির বুঝতে পারে, উত্তরটা হবে খুবই সহজ। সবাই জানে কিন্তু তা অতি সাধারণ বলে কেউ খেয়াল করে না। জাদুকরের সঙ্গে সে একবার দৃষ্টি বিনিময় করে। তারপর, হাত তুলে সবার

বিস্ময়ভরা চাউনির মধ্যেই সে জানিয়ে দেয়, রক্তপায়ী উড়ুক্কু প্রাণীটির নাম মশা।

ইস্, কী সোজা! সমস্ত ভিড় খুশি হয়। হাসেও সবাই। জাদুকর তখন তার মশা-তাড়ানো ধূপের পশরা মেলে সবার সামনে, ধূপ বিক্রি শুরু করে।

আর তিতির প্রত্যেকের মুখের দিকে তাকায়। লটারির টিকিট হাতে-ধরা গোমড়ামুখো লোকটির চাউতে বেশি খিটখিটে বদমেজাজি মুখ আর আছে কিনা দেখবার চেষ্টা করে। বিস্মিত হয়ে তিতির ভাবে, কার পালা আজ ? কে আজ নিখোঁজ হবে ?

জগতের এখন একান্ত প্রয়োজন হল চরিত্র।
জগৎ এখন তাঁদের চায়,
যাদের জীবন প্রেমদীপ্ত এবং স্বার্থশূন্য।
–স্বামী বিবেকানন্দ

অবিশ্বাস্য

–রবীন কর্মকার

রাস্তা একেবারে নির্জন। শুধুমাত্র সাইকেলের ক্যাঁচক্যাঁচ আর ঝিঁঝিঁর ডাক ছাড়া এতটুকু শব্দ শুনতে পাওয়া যাচ্ছে না। বাঁ-হাতের ঘড়িটার দিকে টর্চ ফেলে দেখলাম সাতটা বেজে চল্লিশ মিনিট। ইতিমধ্যে কৃষ্ণপক্ষের ভাঙা চাঁদের আলোয় ভরে উঠেছে চারিদিক। এক হাতে টর্চ আর এক হাতে সাইকেলের হ্যান্ডেল। বিকেলের দিকে একটু বৃষ্টি হয়েছে তাই একটু ঠান্ডা বাতাসও বইছে। এরই মধ্যে দূরের কোন মাঠে শেয়াল ডেকে উঠল। বুকের ভেতরটা কেমন ছ্যাৎ করে উঠল। রাস্তায় কোনো জনমানবের চিহ্ন নেই, আমি একা সঙ্গে আমার সাইকেল।

শহর থেকে টিউশন সেরে বাড়ী ফিরছিলাম। এপ্রিল মাস তাই দিনের আলো থাকতে থাকতেই বেরিয়ে পড়ি, সন্ধ্যায় এসে পৌঁছাই বাড়ীতে। কিন্তু সেদিন একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল। বিকেল পাঁচটা বাজতে না বাজতেই নেমে এল মুষলধারায় বৃষ্টি সেই উন্মত্ত বৈশাখীর তান্ডব আর বিদ্যুতের ধারালো চমক। বৃষ্টি থেমে যখন আকাশ পরিষ্কার হল তখন পশ্চিম আকাশের লালিমাটুকু অবশিষ্ট রয়েছে।

গ্রাম থেকে শহরের দূরত্ব প্রায় সাত-আট মাইল। স্থানের নাম গল্পে ততটা তাৎপর্যপূর্ন নয় তাই সেটা আর লিখলাম না। মাইল তিনেক পাকা রাস্তা যাওয়ার পর ছোট্টো একটি লোকালয় তারপর আবার জনমানবহীন প্রান্তর, পরে আরো দু-খানা গ্রাম পেরিয়ে আমাদের গ্রাম। এতটা পথ ভেঙে পড়তে যাওয়া আবার ফিরে আসা, এই সব ভাবতে গেলেই একটা কথাই মনে পড়ে– 'মাছ ধরিলে খাইবে সুখে, লেখাপড়া করিলে মরিবে দুঃখে'। আমি অবশ্য মাছ ধরার কথা লিখতে বসিনি।

যাক্ একটু গোড়ার কথা বলে নিই। সবে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছি। হাতে কোনো কাজ নেই, পড়াশুনো নেই; শুধু গাঁয়ের মোড়ে বসে সন্ধ্যায় বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা আর বিকেলে মাছ ধরতে যাওয়া এই হয়েছিল দৈনিক রুটিন। আমাদের সব টপ টেন ট্যালেন্টেড বন্ধুরাও একে একে দল ছাড়লো। আমিও বড়দা আর বাবার কাছে বকাঝকা খেয়ে শেষটাই শহরে টিউশন যাওয়াটা শুরু করলাম। সপ্তাহে তিনটে ক্লাস মঙ্গল-বৃহস্পতি–শনি বিকেলে চারটে থেকে বাড়ী থেকে বেরোতম তিনটের সময়। টিউশন সেরে ওখান থেকে বেরোতাম ছটা কি সাড়ে ছটা নাগাদ আর সন্ধ্যে সাতটা কি তার একটু পরেই বাড়ী ফিরে যেতাম।

কিন্তু আজ মনে হয় ফিরতে রাত হয়ে যাবে। পাকা রাস্তা ছেড়ে যখন কাঁচা রাস্তা ধরলাম তখন দিনের আলো আর অবশিষ্ট নেই। না অন্ধকার হয়ে এল এবার টর্চ বের করে নেওয়া দরকার। সাইকেলটাকে রাস্তার একপাশে দাঁড় করিয়ে ব্যাগ থেকে টর্চটা বের করে নিলাম। রাস্তা একেবারে নির্জন মাঝে মধ্যে দু-একটা বাইক দ্রুত পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে। একহাতে টর্চটাকে সামনে উঁচিয়ে ধরে প্যাডেল করতে লাগলাম।

সত্যিই কী অনুপম এই রাত্রি। আকাশে কৃষ্ণপক্ষের ভাঙা চাঁদ, বিকেলে মেঘকে ঝোড়ো হাওয়ায় সরিয়ে উন্মুক্ত আকাশে মিটমিট করছে, অগনিত নক্ষত্র। মাঝে মধ্যে দমকা বাতাস এসে যেন সারা শরীরে হাত বুলিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। রাস্তার দু-পাশের গাছগুলো এক একটা দত্যিদানবের

মতো মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ম্রিয়মান টর্চের আলোয় পথ চলতে লাগলাম। পৃথিবী যেন ভয়ে চোখ বুজে রয়েছে এমনি অন্ধকার মনের মধ্যে একটা সংশয় একটা ভয় উঁকি দিতে লাগল। পাছে চোর-ডাকাতের পাল্লায় পড়ি। এইসব কথা ভাবছি আর সেই বিচিত্র রহস্যময় রাত্রির সৌন্দর্য উপভোগ করতে করতে পথ চলছি; এমন সময় ঘটল এক অঘটন। একটা গাড়ী তার হেডলাইটের আলোয় চোখ ঝলসে দিয়ে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে পাশ কাটিয়ে চলেগেল। একটা আলো আঁধারি পরিস্থিতিতে থতমত খেয়ে নিয়ন্ত্রণ হারালাম আর সেই সঙ্গে সাইকেল সুদ্ধু পড়ে গেলাম রাস্তার পাশের খোলা জমিতে। সারা শরীরে কাদা লেগে এককার। এদিক ওদিক অন্ধকারে অন্ধের মতো খোঁজাখুঁজি করে টর্চ খুঁজে পেলাম। কিন্তু ও হরি! টর্চটা জ্বালতে গিয়ে দেখি সেটা আর জ্বলছে না। ঠোকাঠুকি করেও কোনো ফল হল না। টর্চ জ্বলল না নিজের ভাগ্যের উপর মনে মনে গালিগালাজ করতে লাগলাম। অগত্যা অন্ধকারেই যেতে হবে। কোনো মতে সাইকেলটা টেনে রাস্তায় তুললাম, তুলতে গিয়ে বেশ বেগ পেতে হল। হাতে পায়ে চোট পেলাম সর্বাঙ্গে কাঁটা ফুঠল। রাস্তায় উঠে যথাসাধ্য কাঁটাগুলো ছাড়িয়ে নিয়ে সাইকেল চেপে প্যাডেল শুরু করলাম কিন্তু হায়রে মন্দভাগ্য কিছু দূর এগোতে না এগোতে আবার পড়লাম ধপাস করে। উঠে দাঁড়িয়ে সাইকেলটায় মারলাম এক লাথি। ক্ষোভে দুঃখে মন ফেটে পড়তে চাইছে। হঠাৎ করে একটা আওয়াজ কানে ভেসে এল। হ্যাঁ ঠিক একটা মানুষের গলার আওয়াজ। আওয়াজটা কি অস্বাভাবিক, শোনা মাত্রই বুকের ভেতরটা ছ্যাৎ করে উঠল। পিছন ফিরে দেখি একটা রোগা লিকলিকে ছায়ামূর্তি দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমি কাঁচুমাচু করে বললাম– 'কে ? কী চাই ?' লোকটা আমার কথার উত্তর না দিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে আমার দিকে এগিয়ে এল। এতক্ষণে বুঝলাম লোকটা একটা চাঁদর মুড়ি দিয়ে আছে। আমি কিছু বলার আগেই লোকটা আবার সেই অস্বাভাবিক গলায় বলে উঠল– "সাহায্য করো। বড়ো বিপদে পড়েছি। তোমার সাইকেল করে আমাকে একটু বাড়ি পৌঁছে দাও।"

আমি মনে মনে ভাবলাম এ আবার কোথা থেকে উড়ে এল একেই আমি অসহায় আবার ওকে নিয়ে এই অন্ধকারের মধ্যে সাইকেল চালিয়ে যাব কী কের ? তাছাড়া জানি না, চিনি না অচেনা লোককে এভাবে সাথে নেওয়াটা কী ঠিক হবে ? লোকটার কোনো কু-মতলব তো থাকতে পারে।

লোকটা আবার বলে উঠল, "কী বিশ্বাস হচ্ছে না আমাকে। ভাবছো আমি চোর-ডাকাত। তোমাকে একা পেয়ে তোমাকে লুঠ করব, হয় ?"

আমি ভারি অপ্রস্তুত হয়ে পড়লাম। আমি কিছু বলার আগে লোকটা বলল, "কোনো ভয় নেই আমিও তোমার মতোই অসহায় এক পথিক"। বেশি কথা বাড়িয়ে লাভ নেই এদিকে আবার রাত বাড়ছে। আমি আর কিছু না বলে বললাম, "চলুন, যাওয়া যাক।" বলে তো দিলাম সঙ্গে নেব লোকটাকে কিন্তু হাতে পায়ে যা ব্যাথা সাইকেল চালাতে পারব না বোধ হয়। লোকটা যেন আমারই মনের কথা আঁচ করে বলে উঠল, "ও তুমি ভেবো না আমি সাইকেল করছি তুমি পিছনে বসো।" এরপর শুরু হল সেই অজ্ঞাত ব্যাক্তির সঙ্গে পথ চলা।

লোকটার চেহারা লিকলিকে হলে কী হবে গায়ে শক্তির অভাব নেই। এই অন্ধকারের মধ্যেই সে অনায়াসেই সাইকেল চালাতে লাগল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, " আচ্ছা, আপনি থাকেন

কোথায় ?" লোকটা আমার কথার উত্তর না দিয়ে সাইকেল চালাতে লাগলো। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, "আপনি থাকেন কোথায় ?" লোকটা বলল, "আমাদের কোনো থাকার জায়গা নেই।" ও আবার কী কথা ? থাকার জায়গা তো সবারই একটা থাকে। লোকটা বলল, " এতো কিছু জেনে তোমার কী লাভ ?" আমি বললাম, "বা রে, যা সঙ্গে যাচ্ছি তার সম্পর্কে জানব না ? সে কেমন মানুষ ?" "মানুষ! হাঃ! হাঃ!হাঃ! আর যদি সে মানুষই না হয়–" এই বলে লোকটা খিলখিল করে হেসে উঠল। আমি কিন্তু বলতে যাচ্ছিলাম কিন্তু আমার গলা চিরে আর আওয়াজ বেরোল না। যে দৃশ্য দেখলাম তাতে ভয়ে আমার শিঁরদাঁড়া কনকন করে উঠল। লোকটার মুন্ডুখানা সামনের দিকে নেই আর, সেটা পিছন দিকে ঘোরানো। মুন্ডুটা একটা মড়ার মাথার খুলি। খুলিটা তাকিয়ে তাকিয়ে বিশ্রীভাবে হাসছে সে কি পৈশাচিক হাসি! তারপর যা ঘটল তা ভাবতে আজও আমার মাথার চুল খাড়া হয়ে ওঠে। মূহূর্তের মধ্যে সাইকেলের গতিবেগ বেড়ে গেল। ঝড়ের মতো ছুটতে লাগল সাইকেল। ছুটন্ত সাইকেল থেকে আমি টলে টলে পড়ে যাচ্ছি। ভয়ে, বিস্ময়ে আমার গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোচ্ছে না। এমন সময় সেই অশরীরি চালক তার হাঁড়ের একখানা হাত দিয়ে আমার হাতটা চেপে ধরল। সঙ্গে সঙ্গে আমি আর্তনাদ করে উঠল। হাতখানা একেবারে বরফের মতো ঠান্ডা। ভাবতে লাগলাম– এই অশরীরি চালক আমাকেও কী তার মতো প্রেতপুরীর বাসিন্দা করতে চায়। এদিকে সাইকেল থামার কোনো নাম নেই। এই সময় আমি একটা কাজ করে বসলাম। আমি আমার সমস্ত বল প্রয়োগ করে তার হাতটা আমার হাত থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ছুটন্ত সাইকেল থেকে মারলাম এক লাফ। রাস্তায় পড়ে গড়িয়ে গিয়ে একটা গাছে ধাক্কা খেলাম। তারপর.....

তারপর আর কিছুই মনে নেই আমার চোখ যখন মেলে তাকালাম। দেখলাম আমার মাথায় ব্যান্ডেজ। হাতে পায়ে প্রচন্ড ব্যাথা। আর মাথার কাছে হাতে পাখা নিয়ে বসে আছেন আমার মা।

আমাকে উদ্ধার করেছে আমাদের গ্রামেরই কয়েকজন। গ্রামের মাথায় যে পুকুরটা আছে, সেখান থেকে। আমার সাইকেলটাও পাওয়া গেছে একটু তফাতেই। অ্যাক্সিডেন্ট বুঝে ওরা আমাকে বাড়ী নিয়ে এসেছে। বলা বাহুল্য তখন আমার জ্ঞান ছিল না।

)(

"অক্ষমের লোভ আলাদীনের প্রদীপের গুজব শুনলেই লাফিয়ে উঠে"।
–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ

–বুবাই পাত্র (২য় বর্ষ)

আপনি কি ভ্রমণ পিপাসু।

যদি হয়ে থাকেন তাহলে আপনাকে একবার দক্ষিণে আসতেই হবে। দক্ষিণের ভারত মহাসাগরের গভীর নীল ঢেউয়ে আপনাকে আপ্লুত করবতো বটেই তার সাথে কিন্তু পাহাড় ও আপনাকে ছাড়বে না।

পাহাড় এবং সমুদ্র যদি আপনি একসাথে দেখতে চান তাহলে আপনাকে একবার দক্ষিণে আসতেই হবে।

দক্ষিণের একেবারে শেষপ্রান্তে কণ্যাকুমারীতে এক দিবা-রাত্রি থেকে আপনি সূর্যদয় এবং সূর্যাস্ত দেখতে পারেন। বোটে চড়ে সমুদ্রের দৃঢ় ঘনময় ঢেউ ভেদ করে যেতে পারেন বিবেকানন্দ রক। স্বামীজীর বিগ্রহের প্রত্যক্ষদর্শী হয়ে আপনি চতুর দিকময় সমুদ্রের অনুভূতি উপভোগ করতে পারেন। নিজেকে উদ্ভাসিত করতে পারেন সমুদ্রের বিশুদ্ধ শীতল হাওয়ায়। সমুদ্রের সাথে খেলার পর আপনি পাহাড়ের কাছে যেতে পারেন। দক্ষিণের পাহাড় প্রচুর থাকলেও আপনি কোদাইকানাল অবশ্যই যেতে পারেন। যেকোনো পাহাড়ি এলাকার গাড়ি নিয়ে আপনাকে উপরে উঠে যেতে হবে। পথে আপনি পাশের জানলার কাছে বসে প্রকৃতির সৌন্দর্যের আশায় অপেক্ষরত থাকলে পাহাড় আপনাকে নিরাশ করবে না। গোল গোল ঘুরতে ঘুরতে পাহাড়ি রাস্তা দিয়ে আপনি যত উপরে উঠে যাবেন ততো আবেগ বাড়বে। পাহাড়ের রাস্তা যদি আপনার প্রথম অভিজ্ঞতা হয় তাহলে মাঝে মাঝে ভয়ও লাগতে পারে। তবে তার জন্য দুঃশ্চিন্তার কারণ নেই, এখানকার চালকের এই রাস্তায় হাত খুব মজবুত। চারদিক বৃহতাকার পাহাড়ে ঘেরা নিচের উপত্যকা আপনাকে আকৃষ্ট করবেই আর সাথে সাথে পাহাড়ের ঘর-বাড়ি। এখানকার পাহাড়ি চাষের কথা আপনি জেনে থাকলে আর তার বাস্তব পদ্ধতি দেখলে আপনি অবাক হবেন। এখানে সারি সারি চাষ হচ্ছে বিভিন্ন বাণিজ্যিক ফসল। পুরুষ কর্মীর চেয়ে এখানে মহিলা কর্মী অধিক তাদের কোমল হাতের নিখুঁত কাজ দেখলে আপনি হয়তো আশ্চর্য্যই হবেন। উপত্যকার উপরের ঝর্ণার শব্দ আপনাকে স্থির থাকেত দিবে না। ঝর্ণার আছড়ে পড়া জলে আপনি আপনার দুটি হাত বাড়িয়ে দিতে পারেন তার ক্লান্ত শরীরটাকে বিশ্রাম দেবার জন্য। আকাশভেদী পাহাড়ের শিখরে আপনি চাইলে যেতে পারেন কিন্তু তাহলে আপনাকে পায়ে হেঁটে যেতে হবে। তবে তাতে বিপদ আছে। নিচে নামার সময় পাহাড়ি এলাকার কিছু বিশেষ ফল চাইলে নিতে পারেন।

আপনি ইতিহাস প্রেমী হলে আপনাকে এখানকার মন্দিরে যেতেই হবে। ভাস্কর্যে পূরণ কারুকার্য বিশিষ্ট মন্দিরের গড়ন দেখে আপনি হতবাক হয়ে যাবেন। বিশালাকার পাহাড়-পাথর কেটে কেটে তৈরি হয়েছে সব মন্দির। তাও আবার হাজার সাল পুরোনো, ভাষা যায়। পাথরের উপর নকশা দেখে আপনি সেই নিরক্ষর কারিগরদের বুদ্ধির আর হাতের চিন্তা না করে থাকতে পারবেন না। 'রক টেম্পেল' এর চূড়ান্ত সীমায় এসে একবার হলেও নিচের দিকে উঁকি মারবেন নিজের অবস্থান আকাশের মাঝে মনে হবে। এছাড়াও আপনি দক্ষিণের প্রতিভা দেখতে চাইলে মা মীনাক্ষী মন্দির, শিরঙ্গম যেতে পাবেন। ভারত মহাসাগরের রূপ এখানে মাতৃরূপী। সেই মাতৃরূপী মহাসাগরে স্নান